গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)-এর মুখপত্র

অধিকার

মে-জুন ২০২৪ বিনিময় : ১৫ টাকা

এই সংখ্যায় রয়েছে—

- খোলা চোখে সিএএ... / পৃ. ২
- আমার ভারত ওদের ভাষ্য (৭ম কিস্তি) / পৃ. ৬
- এবার নজরে অরুন্ধতী রায় / পৃ. ৮
- নতুন ডাক আইন / পৃ.১০
- প্রতিবেদন / পৃ. ১১-১৩
- রিপোর্ট / পৃ. ১৩-১৮ এবং পৃ. ৩২
- তথ্যানুসন্ধান / পৃ. ১৮-৩২

সম্পাদনা : পত্রিকা উপ-সমিতি।
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি,
১৮ নং মদন বড়াল লেন, কলকাতা-১২ এর পক্ষে
সাধারণ সম্পাদক : রঞ্জিত শূর (8017437302)
কর্তৃক প্রকাশিত ও
ইনস্ অ্যান্ড আউটস্, বালি, হাওড়া থেকে মুদ্রিত।
E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

অধিকার-এর জন্যে লেখা, মতামত পাঠান
apdr.adhikar@gmail.com

সম্পাদকীয়

এপিডিআর-৫৩

১৯৭২ সালের ২৫ জুন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ, অন্য রকম একটা সময় ছিল তখন। গত শতব্দীর সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার লক্ষ্যে, সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য যে সংগ্রাম চলছিল তাকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিচ্ছিল কংগ্রেস শাসনাধীন ভারত রাষ্ট্র। ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার, মানবাধিকার শব্দগুলি—সবই ছিল তখন নিষিদ্ধ। যত্রতত্র পাওয়া যেত বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের লাশ। রাষ্ট্রীয় বাহিনী কিংবা শাসকদলের পোষা জল্লাদদের তাণ্ডবে মৃত্যু ছিল রোজকার ব্যাপার। জেলগুলি ভর্তি ছিল রাজনৈতিক বন্দিতে। জেল বিদ্রোহ ও বন্দি হত্যা ছিল নিত্যকার ঘটনা। এরকম এক অস্থির সময়ে কিছু অগ্রণী চিন্তাবিদ গঠন করেছিলেন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি বা এপিডিআর।

নাগরিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে ধীরে-ধীরে সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ শুরু করেছিল কলকাতার নাগরিক সমাজ। তাঁদের চিন্তার জোর এতটাই ছিল যে, ২৫ জুন, ১৯৭৫, দেশে জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার পর; মাত্র তিন বছরের সেই শিশু-সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেছিল সরকার। সাময়িক নিস্তব্ধতা বা আড়াল আবডালে সতর্ক পদচারণার পরে ফের গুছিয়ে নিয়ে পথ চলা শুরু উনিশ শ' সাতাত্তরে। নাগরিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে যুক্ত হয় মানবাধিকারের ধারণাও। প্রেক্ষাপট আরও বড় হয়। ব্যক্তির অধিকার, বন্দি মুক্তি, কালা কানুন ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলার মধ্যে দিয়ে শুরু হলেও মানবাধিকারের ধারণা আজ বহুধা বিস্তৃত। ব্যক্তির অধিকারের সঙ্গে সমষ্টির অধিকারের জন্য সচেতন সংগ্রাম আজ এপিডিআর-এর দৈনন্দিন কর্মসূচির অঙ্গ।

বিশ্বায়নের প্রভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রান্তিক হওয়া

অধিকারহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে। প্রান্তিক মানুষের পিঠ আক্ষরিক অর্থেই দেওয়ালে। জল-জমি-জঙ্গলের সংগ্রাম, বেঁচে থাকার সংগ্রাম আজ যেন মানুষের জীবনের বাধ্যবাধকতা। অন্যদিকে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শাসকের নিপীড়নের বিরুদ্ধে জারি আছে মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ। জনতার হাতে নেতৃত্ব চলে যাওয়ার আশঙ্কায় নিজেদের মধ্যে নিপুণ ভাগ বাঁটোয়ারা করে সংসদেই সব প্রতিরোধ আটকে রাখতে চাইছে দেশি-বিদেশি নিয়ন্ত্রকরা। দিল্লি সীমান্তের কৃষক সংগ্রাম, এনআরসি বিরোধী সংগ্রাম, জল জমি জঙ্গলের সংগ্রাম দেশি-বিদেশি শাসকের আতঙ্কের কারণ। জাতিসত্তার সংগ্রামও ফের মাথা ছাড়া দিচ্ছে চারদিকে। জরুরি অবস্থা জারি না করেও ভয়ংকর দমবন্ধ করা পরিস্থিতি। ইউএপিএ-তে হাজার হাজার বন্দি। বিচার নেই! ফ্যাসিবাদী শাসন কাঠামোর উপযোগী করে দন্ড সংহিতা তৈরি। সারা দেশকে পুলিশ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকেই কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্র। ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরতন্ত্র—একটি চরম কর্তৃত্ববাদী শাসন ফের রক্তের বন্যায় ডুবানোর জন্য সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে রেখেছে। অরুন্ধতী রায়ের মত অগ্রণী লেখক-চিন্তাবিদ এবং নাগরিক সমাজের বিরুদ্ধে চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের জন্য রাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে।

৫২ বছরের এপিডিআর-এর উপর এখন অনেক বড় দায়িত্ব; নাগরিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবাধিকার রক্ষার অতন্দ্রপ্রহরী হয়ে উঠার লড়াই জারি রাখা জন্য। নিজেদের ক্রমাগত উন্নত করার মধ্যে দিয়ে সেই দায়িত্ব পালনের যোগ্য হতেই হবে আমাদের—গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)-এর ৫৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে এটাই হোক আমাদের শপথ।

শোক সংবাদ

পি ইউ সি এল-এর প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক ও সাংবাদিক দেবাশীষ আইচ-এর জীবনাবসান

মানবাধিকার সংগঠন পি ইউ সি এল-এর প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক ও মানব দরদী সাংবাদিক দেবাশীষ আইচের জীবনাবসান হয়েছে ২১ জুন, ২০২৪। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

এ পি ডি আর-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিছুদিন আগেও এপিডিআর এর তথ্যানুসন্ধান ওয়ার্কশপে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি উপস্থিত ছিলেন। দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রাম তাঁকে গভীর নাড়া দিত। তাঁর মৃত্যুতে অধিকার আন্দোলন একজন সত্যিকারের বন্ধু হারালো। তাঁর পরিবার ও সহকর্মীদের প্রতি এ পি ডি আর গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

মানবাধিকারে নিবেদিত প্রাণ ও জনদরদী চিকিৎসক শান্তি মল্লিকের জীবনাবসান

২৭ জুন, ২০২৪, জীবনাবসান হল হুগলী জেলার কোন্নগর এলাকার জনদরদী চিকিৎসক শান্তি মল্লিক-এর। তিনি এপিডিআর উত্তরপাড়া-কোন্নগর শাখার আমৃত্যু সভাপতি ছিলেন। এলাকার বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। এলাকার শ্রমজীবী মানুষের অত্যন্ত আপনজন ডাঃ শান্তি মল্লিকের জীবন চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চা ও প্রয়োগের সাথে রাজনীতি বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রয়োগ ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। তাঁর মরণোত্তর চক্ষুদান হয়েছে।

খোলা চোখে সি এ এ, এন আর সি আইন এবং আমাদের ভবিষ্যৎ

দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়

কোনও আইনকে বিচার করতে গেলে একদিকে যেমন সেই আইনের কথাগুলিকে বিচার করতে হয় তেমনিই সেই আইনের না-বলা কথা, ফাঁক ও প্রয়োগের ভূমিকাকেও বুঝতে হয়। সম্পূর্ণ ছবিটাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল যে, সেই আইন কী উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে ও তা, প্রয়োগ করার কী পরিকল্পনা করা হয়েছে তাকে বোঝা। সি এ এ এবং এন আর সি কে বুঝতে গেলে তাই আগে আমাদের বুঝতে হবে এই আইন প্রয়োগের ল্যাবরেটরি আসামের পরিস্থিতিকে।

আসামে সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই (যখন আসাম বাংলার অন্তর্গত ছিল) পূর্ববঙ্গের প্রান্তিক কৃষিজীবী মানুষদের চাষের জন্য ইংরেজ সরকার নিয়ে গেছিল। আসাম দেশে তখন মানুষের জীবনযাত্রা এতটাই স্বনির্ভর ছিল যে সেখানকার মানুষকে দিয়ে নতুন চাষের জমি বা চায়ের বাগান হাসিল করা সম্ভব হয়নি। পূর্ববঙ্গের কৃষি অভিজ্ঞ প্রান্তিক মানুষদের যেমন চাষের জন্য নিয়ে যাওয়া হল তেমনি অন্যদিকে ছোটনাগপুরের জঙ্গল দখল করে সে-দেশের আদিবাসীদের উদ্বাস্তু করে ঠকিয়ে নিয়ে যাওয়া হল চা বাগান পত্তনের জন্য। উনবিংশ শতাব্দীর এই পরিযান পরেও চলেছে। পরে আসাম বাংলার থেকে পৃথক হয়েছে ফলে সেই রাজ্যের প্রভাবশালী অসমিয়া

জনগণের চিন্তাজগতে যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি অন্যদিকে সে রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাদের কয়েক প্রজন্মে নিজেদের জনসংখ্যা বেড়েছে, জীবনযাপনের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এসেছে। ফলে একদিকে তাদের যেমন জমির চাহিদা বেড়েছে তেমনিই কাজের চাহিদাও বেড়েছে। ফলে তারা পূর্ববঙ্গ থেকে উঠে আসা গরীব চাষীদের পরবর্তী প্রজন্মকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে করেছে। এইখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তারা কোনদিনই চা বাগানের আদিবাসীদের নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করেনি। তার কারণ, সেই আদিবাসীদের সেই রাজ্যে কোনও সংরক্ষণ না-থাকায় তাদের পক্ষে কেবল চা বাগানেই কাজ করা বা অত্যন্ত সস্তায় অন্যত্র শ্রমিকের কাজ করাই সম্ভব ছিল। সেই সব আদিবাসীদের পক্ষে জমিজমা কিনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াও সম্ভব হয়নি। তারা এতটাই রিক্ত ও সর্বহারা যে তাদের দিক থেকে সম্পন্ন অসমিয়াদের সাথে প্রতিযোগিতার কোনও সম্ভাবনা কোনদিনই ছিল না বললেই চলে। ফলে, চা আদিবাসীরা ভূমিপুত্রদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলনা, সস্তার শ্রমের উৎস হিসেবে সেখানের স্বচ্ছল মানুষের তাদের প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে উপজাতি নির্ভর আসামের সংস্কৃতির সাথে সেই ছোটনাগপুরের নিঃস্ব আদিবাসীদের স্বভাব সংস্কৃতির খানিকটা মানসিক নৈকট্য ছিল।

এইভাবে আসামের ভূমিপুত্রদের যখন আর্থিক সংকট ধীবে-ধীরে সৃষ্টি হল তখন তাদের মধ্যে ক্ষমতাবান অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত অংশটি তাদের সেই সঙ্কটের কারণ হিসেবে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষদেরই চিহ্নিত করল। এর মধ্যে আবার দেশভাগের কারণে আসাম সংলগ্ন পূর্বপাকিস্তান থেকে এক বড় সংখ্যক গরীব মানুষ সেখানে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে, ফলে জনগঠনে আবার পরিবর্তন হয়েছে। তার ওপর একাত্তরের ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধে আবার ছিন্নমূল মানুষের স্রোত এসেছে এবং সেই বাঙালী উদ্বাস্তুদের ওপর সে-দেশের মানুষের রাগ বাড়তে থেকেছে। একই সময়ে কিন্তু সেই হারে না-হলেও অনেক আদিবাসীও চা বাগানে এসেছে, অন্য রাজ্য থেকে শ্রমিক সেখানে এসেছে, সেনাবাহিনীর এক বিশাল সংখ্যক উপস্থিতি আসামের নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও সে রাজ্যের মধ্যবিত্ত ও ক্ষমতাবানের মধ্যে বাঙালীদের একমাত্র শত্রু বলে ভাবা আরও দৃঢ় হয়েছে। এর মধ্যে হয়তো অসমিয়াদের প্রতি আগত বাঙালীদের আচরণের কিছুটা ভূমিকা আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় যা', তা' হল আসামের বরাক উপত্যকা মূলত বাঙালী অধ্যুষিত। ফলে সে-রাজ্যের প্রভাবশালী অসমিয়া ও অন্যান্য ভুমিপুত্রদের মনে হয়েছে তাদের ভূখন্ডের উদ্বাস্তু বাঙালীরা একদিন ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে এই ধরণের ঘৃণা ও জাতিবিদ্বেষ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে সঙ্কটের সময়ে খুব সহজেই ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় এবং তা ক্ষমতাবানরা করতেও পেরেছে। সেই বিদ্বেষ প্রায় সমস্ত অসমিয়া মানুষদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছে এমন-কী তা অসমের অন্যান্য জনগোষ্ঠীদেরও প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে, এই সব দরিদ্র বাঙালী উদ্বাস্তুরা একেবারেই ক্ষমতাহীন ফলে সরকারের সব স্তরেই ধারাবাহিকভাবেই তাদের ও আদিবাসীদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। ফলে, যখনই 'বাঙালী খেদাও' আন্দোলন হয়েছে তখনই রাজ্যের সরকার, প্রশাসনও অসমিয়া জনগণের সাথে এই নিধনে অংশ নিয়েছে। ফলে দেশের অসমিয়া ও অন্যান্য ভূমিপুত্রদের বাঙালী বিদ্বেষ সরকারি স্তরেই মান্যতা পেয়েছে। এই ধরণের সব আন্দোলনই কোনও-না-কোনও ভাবে কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের মদতেই পরিচালিত হয়েছে।

এই আন্দোলনের চাপে পড়ে ১৯৮৫ সালে 'অসম চুক্তি' করা হয় যেখানে সেখানকার বসবাসকারীদের নাগরিক হিসেবে নথিভূক্ত করা শুরু হয় (যদিও ১৯৫১ সালেই কেবল আসামের জন্য এইরকম নাগরিক নথিকরণের কথা বলা হয়েছিল)। এই আইনের লিখিত উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত নাগরিক নির্বাচন করা। আর প্রায়োগিক তাগিদ ছিল বেছে-বেছে বাঙালিদের বে-নাগরিক বানানো ও সেই রাজ্যের বড় সংখ্যক মানুষের মধ্যে জমে থাকা ঘৃণা বিভেদের বিষকে প্রতিপালন করা। যেমন ধরুণ নাগরিকত্ব পেতে গেলে যে-যে কাগজ লাগে তা' যে কোন উদ্বাস্তু মানুষ প্রথমেই জোগাড় করে রাখে এমন-কী সেই সব নথি অনেক প্রকৃত অধিবাসীদেরও থাকে না। ফলে সেই আইনে যদি কাগজ দেখেই নিরপেক্ষভাবে নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা হয়, তা'তে অনেক মূলনিবাসী বিশেষ করে গরীব ভূমিহীন অধিবাসীর বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকত। এখানেই আসল আইন প্রয়োগের কারসাজি। সমস্ত স্তরে অসমিয়া সরকারী কর্মচারীদের দাপটে সেই আইন আসলে 'বাঙালী খেদাও' আইন হয়ে গেল। খেয়াল করবেন যে সেই আইনে চা বাগানের একেবারে হতভাগা নিঃস্ব আদিবাসীও কিন্তু সেই পরিমাণে বে-নাগরিক হল না। সেখানকার ক্ষমতাবান ভূমিপুত্র মানুষের জমিতে বাজারের থেকে তিনভাগের একভাগ দামে কাজ করান হয় আজকের চা-আদিবাসীদের, কারণ চা বাগানে আর তাদের কাজ নেই বললেই চলে। আবার আজ সম্পন্ন অসমিয়াদের চাষের

জমিগুলোই এখন এক-একটা ছোট-ছোট চা বাগান হয়ে উঠেছে এবং সেখানে এই আদিবাসীদের চা বাগানে কাজের অভিজ্ঞতার জন্যই কাজে লাগে। সবদিকে বঞ্চিত বলেই তাদের অনেক সস্তায় সেখানে কাজে লাগানো যায়। তাদের তাড়ালে আসামের চা-নির্ভর কৃষি অর্থনীতি একরকম ধসে যাবে। ফলে অনেকের মধ্যে যে-ধারণা আছে; এই আইন সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই বিপদ সেই ধারণা আসলে বাস্তববর্জিত এক কল্পনা এবং সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার এক কৌশল। এই প্রবণতা আজকে এই ধরণের এন আর সি বিরোধী আন্দোলনের এক বড় অংশের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আর তাদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ক্রমেই কমতে থাকছে। এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যখন দেখা যায় যে অনেকে ভেবেছিলেন, আসামের নাগরিকত্ব হারানোর তালিকায় এক বড় সংখ্যক নেপালি অনুপ্রবেশকারীর (এক লক্ষের মত) নাম পড়েছে কিন্তু তারা জানেন না যে, সেদেশের প্রতিষ্ঠানের কাছে, ক্ষমতাবান অসমিয়াদের কাছে নেপালিরা শত্রু নয়। আর তাই তাদের সন্দেহকে জল ঢেলে এক পেনের খোঁচায় সব নেপালিকে বৈধ ঘোষণা করে দেওয়া হল। কোনও এক আইন যদি মানুষের জাতিগত পরিচয়ের ওপর কেবল নির্ভরশীল হয় তাহলে বলা যায় সেই আইন ও তার প্রয়োগের মধ্যে হিটলারের ইহুদী খোঁজার ভূত বাঙালী খেঁদাও হিসেবে জন্ম নিচ্ছে। এই সত্যকে আড়াল করা যাবেনা। এই আইনের বিরোধী সংগঠনদের কোনও ভাবেই মাথায় আসেনি যে, সব মানুষের নাগরিকত্ব প্রমাণের সাক্ষ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত ছিল যাতে এই আইনের নিরপেক্ষতা প্রমাণিত হয়। এর কারণ সম্ভবত এই সব সংগঠন যারা করেন তারা শখে করেন তাদের কেউ প্রকৃত ভুক্তভোগী নন। প্রকৃত ভুক্তভোগীর কঠিন বাস্তবের অলিগলির খোঁজ সেই সব সংগঠকদের কাছে থাকে না। আসামের ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানি না, তা' হল অসমিয়া মানুষের বিদ্বেষ বাঙালীদের প্রতি এবং তা'তে হিন্দু মুসলমানে তফাৎ-তো নেই বরং তদের রাগ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি অনেক বেশী। ফলে আসামের এন আর সি তালিকায় অস্বাভাবিক বেশী সংখ্যক হিন্দুদের নাম বাদ পড়া ধর্মীয় মেরুকরণের বিপরীতে সেই রাজ্যের বাস্তবের প্রতিফলন।

আসামের এই পরিস্থিতিতে পরবর্তীকালে অন্য এক মাত্রা যোগ হয়েছে। সামরিক তাগিদেই হোক বা শাসনের তাগিদেই হোক আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই-যে; আসামের সর্বত্র আজ মিলিটারীর অবাধ গতি। আজ সেই মিলিটারীর উপস্থিতি যেমন সেখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক হাতিয়ার তেমনিই এর মাধ্যমে মিলিটারীর গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। আজকে সেই সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর লেজ ধরেই আসামে উত্তরভারতের হিন্দিভাষী বেকার মানুষ ছুটে আসছে সেখানে কাজের লোভে, বসবাসের লোভে। তাদের কাছে বাঙালী শ্রমিক এক প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে তারাও আজ চায় আসামের বাঙালীদের কোণঠাসা করতে ও তাড়াতে। একসময়ে অসমিয়া জাতিসত্তা আন্দোলনের এক সংখ্যালঘু অংশ এই হিন্দিভাষীদেরও অনুপ্রবেশকারী বলে মনে করত ফলে তদের বিতাড়ন করার কিছু-কিছু ঘটনা ঘটত। কিন্তু আজ সেই অংশের হাতে আর আন্দোলনের রাশ নেই। আজ সব আন্দোলনকারীই হিন্দি, হিন্দু আধিপত্যকে মেনে নিয়েছে। অন্যদিকে, আজ প্রায় সব রাজ্যের মতই অসমের এক বড় অংশ কেন্দ্রীয় সরকার ও তার হিন্দিভাষী দোসরদের অধীনতা মেনে নিয়েছে। ফলে তাদের বিরোধিতা বলতে আজ কেবল পড়ে আছে দুর্বল বাঙালীদের প্রতি বিদ্বেষ। আজ সেই বিদ্বেষের পেছনে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের মদত দিনের আলোর মত পরিষ্কার। আজ অসমের বাঙালীদের অস্তিত্ব সত্যিই বিপন্ন এবং সেই বিপন্নতা আরও প্রকট হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নির্দেশে এন আর সি র পক্ষপাতদুষ্ট প্রয়োগে। সারা দেশের সাপেক্ষে সি এ এ ও এন আর সি র তাৎপর্য্য বুঝতে গেলে আসামের এই পরিস্থিতিকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

আসামের ১৯৮৫ সালের চুক্তি ও তার প্রয়োগে বোঝা গেছে যে একটা জাতিকে শত্রু বানিয়ে, বিদেশী তকমা দিয়ে তাদের বেঁচে থাকাটাই অভিশপ্ত করে তোলা সম্ভব। আসামের বহু-জাতীয় সমাজে এইভাবে একটা জাতিকে শত্রু বানানোর পদ্ধতি ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শক্তির কাছে এক উদাহরণ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সৃষ্টির পরেও বহু মানুষ সেই দেশ ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হন। বাধ্য হয়ে চলে আসা বাঙালীদের প্রচারের গুজবে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী মুসলমান বানায় আর এস এস ও বিজেপি; যা'তে বাঙালিদের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করা যায়। অনুপ্রবেশকারী তকমা দিয়ে বাঙালী মুসলমানদের দেশ থেকে বিতাড়ন করাই যে বিজেপির লক্ষ্য তা' আশির দশকের শেষের দিক থেকে প্রচারে নামায় তারা। এর ফলে একদিকে যেমন বাঙালীদের ঐক্যে ধর্মীয় ফাটল ধরে, তেমনিই সারা দেশের কাছে বাঙালী 'বাংলাদেশি' হিসেবে ভিলেন হয়ে যায়। এই বে-নাগরিক করার এন আর সি-কে যা'তে মানুষ সমবেতভাবে প্রতিবাদ করতে না-পারে তাই বাঙালীকে ভাগ করার জন্য সি এ এ র টোপ দেওয়া হচ্ছে। তা'তে বলা হচ্ছে যে আপনাকে

বে-নাগরিক তকমা থেকে মুক্তি দিয়ে সত্যিই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তবে আপনাকে নিজেকেই আগে স্বীকার করে নিতে হবে যে, আপনি ভারতের নাগরিক নন এবং তারপর সরকার ও তার আমলাবাহিনীর দয়ায় আপনার নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এইভাবে এক বড় সংখ্যক মানুষকে নাগরিকত্বের লোভ দেখিয়ে বাঙালির সমবেত প্রতিবাদে ভাঙ্গন ধরাণো চলেছে। আর এইভাবে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন জাতিকে সহজেই এন আর সি র বলিকাঠে চড়ানো সম্ভব হচ্ছে। অথচ যদি আপনি এই সি এ এ আইনে নিজের নাগরিকত্ব পেতে চান তাহলে আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনি বাংলাদেশ, পাকিস্তান ইত্যাদি প্রতিবেশী দেশ থেকে বৈধ পাসপোর্ট নিয়ে ভারতে ঢুকেছেন এবং সেই পাসপোর্ট না-দেখাতে পারলে আপনার নামই নথিভুক্ত করা যাবে না। আজ অনেক বিজেপির নেতা আপনাকে বোঝাচ্ছে যে, সেই পাসপোর্ট পরে দেখাব বলে আপনি ফর্ম ভরুণ, কিন্তু যা' আপনার কাছে নেই তা' আপনি ভবিষ্যতেই বা কী করে দেখাবেন! বিজেপির ঠকানোর ফাঁদে পড়ে নির্বোধ বাঙালী জাতির সর্বনাশ হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা!

এর সাথে-সাথে মনে রাখতে হবে, এক জাতি, একভাষা, এক ধর্মের মুখোশে হিন্দু হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ বাঙালীদের এক বড় অংশকে হিন্দু, হিন্দি, হিন্দুস্তান পূজারী বানিয়ে ফেলেছে। আজ অধিকাংশ বাঙালী, বাঙালী হওয়ার চেয়ে, দ্বিতীয় শ্রেণির ভারতীয় হয়ে থাকতে ভালবাসতে শুরু করেছে। সেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মানসিকতাও আজ এই জাতির প্রতি অন্যায় করাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক মান্যতা দিচ্ছে। এই ক্লীবতাই কিন্তু আজ আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য বানাতে শাসকদের সুবিধা করে দিয়েছে সারা দেশের কাছে আমাদের বিভেদ ও দুর্বলতাকে প্রকাশ করে দিয়েছে।

দেশের মধ্যে এক দুর্বল জনগোষ্ঠী বাঙালীকে 'বাংলাদেশি' ছাপ্পা দিয়ে সারা দেশের 'পাঞ্চিং ব্যাগ' বানানোর পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। এই পরিকল্পনাকে সরকারি সিলমোহর দেওয়ার জন্যই আজ এন আর সি আইন আনা হয়েছে; আর এর প্রয়োগও হবে সেই প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে। আজ যারা মনে করেন যে, এই আইন দেশের আপামর জনগণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে তারা সম্ভবত সমস্যার গভীরতাকে লঘু করে দিচ্ছেন, হাওয়ার সাথে যুদ্ধের ডাক দিচ্ছেন। আজ আধার কার্ড ও তার প্রযুক্তি আপনাকে সহজেই বে-নাগরিক করে দিতে পারে কেবলমাত্র সেই কার্ডকে ডি আক্টিভেট করে। ফলে আজ সবার ক্ষেত্রেই বেছে-বেছে বে-নাগরিক বানানোর এই এক সহজ রাস্তা আছে। এন আর সি আইন ও তার পক্ষপাতিত্বপূর্ণ প্রয়োগ করা হবে আসামের মত বাংলার ক্ষেত্রে যা'তে সারা দেশের মানুষ বাঙালীর নামে 'বাংলাদেশি' দমণের মজা পায় এবং কর্পোরেটের হাতে নিজেদের সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়াকে হাসি মুখে মেনে নেয়। বাঙালী পেটানোর আনন্দে নিজের দুঃখ ঢাকে। সম্ভবত সেই কারণেই এই রেজিষ্টার তৈরী করার কোনও সুনির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা নেই। এই আইনের সংশোধনীতে বলা হয়েছে (২) The Central Government may maintain a National Register of Indian Citizens and for that purpose establish a National Registration Authority। অন্যদিকে দেশের প্রতিবাদী মানুষকে খুব সহজেই বেছে বেছে আধার নিষ্ক্রিয় করে বে-নাগরিক বানানোর ব্যাকডোর-তো আছেই। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের তাগিদেই সামাজিক বিভাজনের জন্য তা' প্রয়োগ হবে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ক্ষেত্রে, কর্পোরেটের জল জঙ্গল জমি লুঠের জন্য তা' প্রয়োগ করা হবে প্রতিবাদী মুষ্টিমেয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর যা'তে দেশের মানুষের প্রতিবাদের কোনও আওয়াজই আর না-পড়ে থাকে। আজকের কর্পোরেট লুণ্ঠনের দোসর হিসেবে এই প্রক্রিয়া যেমন চালানো হবে তেমনি বাঙালী ও বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের 'বাংলাদেশি' বানিয়ে সস্তায় বা বিনাপয়সায় কাজ করানোর রাস্তাও খোলা রাখা হচ্ছে। মনে রাখবেন, একটা বড় সংখ্যক শ্রমিকের যদি কোনও সামাজিক ও নাগরিক অধিকার না-থাকে তা' আদতে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকের রোজগারে আঘাত আনবে। এইভাবে এই আইনের হাত ধরে কর্পোরেট কোনরকম অধিকার ও দাবিদাওয়াহীন এক সস্তার ঠিকা শ্রমিক তৈরীর সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। এই আইন-ই শ্রমজীবিদের বিভক্ত করে কোনরকম সমবেত দাবীদাওয়ার আন্দোলন করার পথে এক বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

আজ মনে রাখতে হবে, নাগরিকত্বের সঙ্কটে আজ বাঙালী জাতি এবং কেবল বাঙালী জাতিই সমষ্টিগতভাবে আক্রান্ত। দেশ বিভাজনে ক্ষতিগ্রস্ত পঞ্জাবের মানুষ শুধু রাজকীয় অভ্যর্থনাই পায়নি তাদের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে এমন মনযোগ দেওয়া হয়েছিল যে তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা প্রায় নেই বললেই চলে। অন্যদিকে বাঙলার মানুষ দেশভাগের সবচেয়ে বড় শিকার হয়েও ভারত সরকারের থেকে তুলনায় কিছুই প্রায় পায়নি। বিনিময়ে জুটেছে অনুপ্রবেশকারীর পরিচয়। এই সমস্যা দেশের আর কারুর নেই। ফলে এই লড়াই দেশের আমজনতার লড়াই নয়। লড়াই করে এই আইন বাতিল করা

হয়ত সম্ভব, কিন্তু মনে রাখবেন তা'তে দেশের কোনও মানুষের সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে (যেমন কাশ্মিরী বা প্যালেস্টাইনের ক্ষেত্রে ঘটেছে বা একদিন ইহুদিদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল)। তাই নিজেদের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এই আইন যেন আমাদের রাজ্যে প্রয়োগ না-করা হয় বা যদি একজন বাঙালীকে যদি এই আইনে বে-নাগরিক বানানো হয় তাহলে সর্বাত্মক ভাবে সব্বাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে আগুন নিয়ে খেলতে গেছে এই আইনের হোতারা। ঠিক তেমনিভাবে যদি বেছে বেছে যদি প্রতিবাদী মানুষ, আদিবাসী বা মুসলমানদের বে-নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাহলে আমাদেরই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মনে রাখবেন আজকের হিন্দু হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ বাংলা দখলের ছক কষছে যার মূল হোতা বিজেপি। ওরা বাঙালীদের তাড়ানোর জন্যই বসে আছে যাতে সেই জায়গায় বাংলা দখল করে উত্তরভারতীয় হিন্দিভাষী অনুপ্রবেশকারীরা। এই চক্রান্ত যদি না প্রতিরোধ করতে পারি তাহলে কিন্তু বাঙালি জাতিই কয়েক প্রজন্মেই ভারতে লুপ্ত হয়ে যাবে। বাঙালীর ভাষা, চেতনা ও সংস্কৃতির হিন্দি ও হিন্দুত্বমুখী অবক্ষয় খুব দ্রুত আমাদের সেই দিকে নিয়ে চলেছে। আমাদের আজকের পদক্ষেপ ভবিষ্যত কী হবে, তা' ঠিক করবে।

আমার ভারত ওদের ভাষ্য

সোমনাথ বসু

[যোজনা কমিশনের উদ্যোগে ২০০৬ সাল, উন্নয়নের পথে (মাথা চাড়া দেওয়া) অসন্তোষ, অশান্তি এবং চরমপন্থার কারণ অনুসন্ধানে ১৬ জন বিশিষ্ট সদস্য নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞমন্ডলী তৈরী হয়। ২০০৮ সালে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। যদিও এই রিপোর্ট জন-সমকিযে আসেনি।]

(সপ্তম কিস্তি)

এস সি/ এস টি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের ওপর ধারাবাহিক সন্ত্রাসের তালিকা সরকারিভাবেই দীর্ঘতর হচ্ছে। গত সংখ্যায় আমরা তার কিছু তালিকা তুলে ধরেছিলাম। এবার সেই তালিকারই পরবর্তী অংশ....

Social rights violation (প্রাপ্য সামাজিক অধিকার গুলির ক্রমাগত লঙ্ঘন)

১) ১২ই জুন, ১৯৯৯, অন্ধ্রপ্রদেশের গজুলামাণ্ড্যায়াম (Gajulamandyam) অঞ্চলে প্রভাবশালী রেড্ডি সম্প্রদায় একটি নলকূপ থেকে পাইপ লাইন বসিয়ে জল টেনে নিতে চায় কিন্তু দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ প্রতিরোধে নামে এবং কাজ আটকে দেয়।

ফল:

১) এর বদলায় দলিতরা সামাজিক বয়কটের শিকার হয় এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের থেকে তাদের জোর করে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

২) বিহারের গঙ্গাপুরে উচ্চবর্ণের যাদব সম্প্রদায় মুসাহার সম্প্রদায়ের বসবাসের অঞ্চল থেকে রেল লাইনে যাওয়ার একটি সিঁড়ি ভেঙে নষ্ট করে দেয়। দলিতরা স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার থেকেও বঞ্চিত। এই ঘটনাটা এই উদ্দেশ্যেই পরিকল্পনামাফিক ঘটানো হয়েছে যাতে তাদের গতিবেধি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও কাটছাঁট করা যায় যাতে তারা উচ্চবর্ণের সঙ্গে মিশতে না-পারে।

৩) কর্ণাটকের এক দোকানে কিছু দলিত জোর দিয়ে হোটেলে সবাই যে কাপে খায় সেই কাপ ব্যবহারের দাবি তুলেছিল। কিছু দলিত যুবকদের সঙ্গে এই নিয়ে উচ্চবর্ণের হোটেল মালিকের ছোটখাটো বচসা হয় কিন্তু তার ফলে দলিতদের ওপর প্রচন্ড আক্রমণ হয় ও তাদের সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হয়।

৪) ২০০১সালের সেপ্টেম্বর মাসে মধ্যপ্রদেশের মোড়েনা জেলার কলু ডান্ডার ছাত্র/যুবদের মধ্যে একটা ছোটখাটো ঝগড়া বিবাদ এর ঘটনা—এর ফলে উচ্চবর্ণের ক্ষমতাবান মানুষের দলবল দলিত ছাত্রদের মেরে ফাটিয়ে দেয় এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দলিতদের কুটির গুলিতে আক্রমণ করে ও অবরুদ্ধ করে দেয়।

৫) তামিলনাড়ুর সেনগেনিয়াম এ দলিত মানুষরা তাদের জন্য বরাদ্দ সরকারি টিভি দলিতদের কলোনিতে রাখার দাবি জানিয়েছিল। ফল—এই স্পর্ধায় পঞ্চায়েত প্রধান রেগে আগুন হয়ে ওঠে এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে দলিতদের বাড়িঘর আক্রমণ করে তছনছ করে দেয়।

৬) দলিত সম্প্রদায় জল চুরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল, জবাবে তাদের জল নেওয়াই পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হল।

৭) উচ্চবর্ণ কর্তৃক জাতি সম্প্রদায় ধরে ধরে নিকেশ করে দেওয়ার ঘটনা সাম্প্রদায়িক বয়কট এবং সামাজিক অবনমনের খাঁড়া দলিতদের ওপর নেমে আসা।

৮) দলিত হয়ে জন্মানোই যেখানে অপরাধ—দলিত বলেই

তাদের এক ঘরে করে রাখা, খাদ্য সহ কোন দরকারী জিনিসই যেন তারা না-পায় এমন অবস্থা ও ব্যবস্থা সৃষ্টি করা।

৯) দলিতরা জমি এবং মাথা গোজার ঠাই চেয়েছিল। এই অপরাধে তাদের যেটুকু ঘর বাড়ি ছিল তাও গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

১০) সরকারি চাপকলে দলিতরা স্নান করেছিল। তাদের গালিগালাজ করা হয়। জামা কাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়। মারধর করা হয়। অত্যাচার চালানো হয়। আর জলের ধারে কাছে যাওয়া তো বন্ধ করে দেওয়া হলই।

১১) দলিতরা কথায়-কথায় সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়। বহুদলীর আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।

১২) অভিযোগ, দিনজাতের মানুষকে অপহরণ (eloping) করা হয়েছে জনৈক দলিত রমণীকে জামাকাপড় ছিঁড়ে তাকে কুৎসিত গালিগালাজ করা হয়।

১৩) সর্বসাধারনের ব্যবহার্য পাম্পের জল নিয়ে বিতন্ডা উচ্চবর্ণের মানুষেরা ব্যাপকভাবে জাতি সন্ত্রাস ও জাতি ধরে নির্মূলিকরণ করার অভিযান চালায়।

১৪) গাছ কাটা হচ্ছিল। পঞ্চায়েত কর্মকর্তাকে তাই নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। দলিত মহিলা পঞ্চায়েতকেই সামাজিকভাবে বয়কট করে দেওয়া হয়।

১৫) জাতি গত উত্তেজনা (cast tension) জিইয়ে রাখা হয় ।কখনোই নিভতে দেওয়া হয় না। সবার জন্য ব্যবহারের জলের ধারে কাছে দলিতদের ঘেঁষতে দেওয়া হয় না।

অর্থনৈতিক অধিকার হরণ (Economic Rights Violation)

১) অন্ধ্রপ্রদেশের এস সি/ এস টি কমিশনের জাস্টিস পুণ্যাইয়ার কাছে সে রাজ্যের আলামু'র দলিত সম্প্রদায় তাদের মামলা ও তার গুরুত্ব তুলে ধরে— দলিতদের ওপর এর ফলে নেমে আসে সামাজিক বয়কট। তাদের মজুরি কমিয়ে দেওয়া হয় এবং ন্যায্যমূল্যের দোকানে পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগও কেড়ে নেওয়া হয়।

২) একজন উচ্চ বর্ণের মানুষ দলিত নারীর অশালীন ব্যবহার করলে দলিতরা প্রতিবাদ করে। এই অপরাধে তাদের সামাজিক বয়কট শুধু নয় সমাজচ্যুত করার পাশাপাশি সম্পূর্ণভাবে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে সেখানে থাকতে বাধ্য হয়।

৩) পুলিশের পাহাড়ায় গায়ের জোরে দলিতদের জমি দখল। দলিতদের ভয় দেখানো হয়। মারধর করা হয়। এবং তাদের জমি জোর করে দখল করে নেওয়া হয়।

৪) উচ্চবর্ণের লোকেরা দরিদ্রের জমি দখল করে। প্রতিবাদ করলে বন্ধুকোঠে মানুষ চরম সন্ত্রাসে দিন কাটাতে বাধ্য হয়।

৫) দলিতদের জলের ধারে-কাছে যাওয়া বারণ হয়ে যায়। যারা প্রতিবাদ করে তাদের ওপর আক্রমণ নামে। ব্যাপক মারধোর হয়।

৬) সাধারণ চারণ ভূমিতে গরু-মোষ ঘাস খায় তাই নিয়ে ঝগড়া। দলিতদের থাকবার জায়গাগুলো মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

৭) ঢাক বাজানোর মজুরি হিসেবে দলিতরা মিনিমাম ওয়েজেস চেয়েছিল। উত্তরে গালিগালাজ থেকে মারধর কিছুই বাদ যায় না।

৮) জোর করে দলিতদের জমি নিজেদের দখলে ঢুকিয়ে নেওয়া (encroachment) উচ্চবর্ণের লোকেরা বিশ্বাস করে সর্বসাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত জমিতে দরিদ্রের কোন অধিকার থাকারই কথা নয়।

৯) সাধারণ সীমানার জমিতে চাষ করা নিয়ে বিবাদ। দলিতদের ঘরবাড়ি আক্রমণ ও ধ্বংস। তাদের সর্বসাধারণের রাস্তা- জমি -দোকান.....সবকিছুতে ঢোকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাদের নলকূপের জল বা পশু চড়ানোর মাঠ....সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়।

১০) কোন এক জায়গায় প্রাকৃতিক কারণেই কাঁচা ইট নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য দলিতরাই দায়ী; এই অজুহাত তুলে তাদের নির্দয়ভাবে ঠেঙানো হয়।

১১) দলিতদের বিরুদ্ধে ভুরি-ভুরি মিথ্যে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়। তাদের পদে পদে অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। মানুষ হিসেবে সামান্য মর্যাদাটুকুও পদদলিত করা হয়।

১২) ধার শোধ করতে না পারার সাজা। সম্পূর্ণ নগ্ন করে দলিত নারীকে রাস্তায় ঘোরানো হয়।

১৩) জমি সম্পর্ক বিবাদের সমাধান না হওয়া। বর্ণ হিন্দুরা দরিদ্রদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালায়

১৪) দলিতদের ধার নেওয়া এবং শোক দিতে না পারা। দলিতদের জমি নিলামে চড়ানো হয় অনেকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।

১৫) একটা উটের মালিকানা স্বত্ব নিয়ে বিতর্ক। উচ্চবর্ণের হিংস্র আক্রমণে দলিত সম্প্রদায়ের ৭ জন নিহত ও ১৩ জন

গুরুতররূপে আহত হয়।

১৬) দলিতদের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি জমি দলিতদের ত্রিশটি বাড়িতে আগুন লাগানো হয় এবং উচ্চবর্ণের হাতে চারজন গুরুতর রূপে জখম হয়।

১৭) উচ্চবর্ণের হাতে একজন দলিত প্রতারিত হয়। তারপরও তাকেই হুমকি দেওয়া হয়। দলিত সম্প্রদায়ের একজন বাধ্য হয়ে আত্মঘাতী হয়।

১৮) দলিত বন্ডেড লেবার। দলিতদের মিনিমাম ওয়েজের কোন বালাই নেই।

১৯) ছয় মাসের মজুরি দাবি করা হয়েছিল। দলিত ছুতোরটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রচন্ড মারধোরের পর মল ও মূত্র খেতে বাধ্য করানো হয়।

২০) সংরক্ষণ অনুযায়ী চাকরির দাবি তোলা। উচ্চবর্ণের মানুষটা মনে করে তাদের চাকরিতে ভাগ বসানো হচ্ছে। তাই দলিত সম্প্রদায়ের ওপর ব্যাপক সন্ত্রাস নামানো হয়।

ক্ষমতায় বসেই কন্ঠরোধে তৎপর কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, এবার নজরে অরুন্ধতী রায়

রূপম চট্টোপাধ্যায়

১৪ বছরের পুরণো একটি মামলায় লেখক অরুন্ধতী রায়ের বিরুদ্ধে আন ল-ফুল এ্যাক্টিভিটি প্রিভেনশন অ্যাক্ট (ইউএপিএ) ধারা প্রয়োগ করে মামলা দায়েরের অনুমোদন পেল দিল্লি পুলিশ। অনুমোদন দিল দিল্লির উপরাজ্যপাল। ২০১০ সালের অক্টোবরে দিল্লির এল টি জি অডিটরিয়ামে “Azadi- the only way” শীর্ষক এক আলোচনা সভায় অরুন্ধতী রায় বলেছিলেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। তাঁর যুক্তি ছিল অবিচ্ছেদ্য নয় বলেই পুলিশ মিলিটারি দিয়ে কাশ্মীরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হচ্ছে।

এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন অনেকে। সংবাদ মাধ্যমে এই মন্তব্য নিয়ে আলোচনাও কম হয়নি। উল্টোদিকে, কাশ্মীর উপত্যকা সহ দেশের বহু মানুষ তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অরুন্ধতী’র বক্তব্যকে জোরালো সমর্থন দিয়েছিলেন। এরপরও জনৈক সুশীল পন্ডিতের অভিযোগের ভিত্তিতে দিল্লির মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে ২০১০ সালের ২৮ অক্টোবর, এফআইআর দায়ের করা হয় বুকার পুরস্কার জয়ী লেখক অরুন্ধতী রায়, কাশ্মীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক আইন বিভাগের অধ্যাপক শওকত হোসেন, রাজনৈতিক নেতা সৈয়দ আলি শা গিলানি এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ আব্দুল রহমান গিলানির বিরুদ্ধে। শেষের দু’জনের মৃত্যু হয়েছে এই মামলা চলাকালীন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ (রাষ্ট্র বিরোধী), ১৫৩ এ (বিভেদ সৃষ্টি), ১৫৩ বি (সংহতি বিপন্ন), ৫০৪ (ব্যঙ্গ বিদ্রুপ , শান্তি ভঙ্গ), ধারা ৫০৫ (জনতাকে প্ররোচিত করা) ইত্যাদি ধারায় ১৪বছর আগে দায়ের করা মামলা তামাদি হয়ে গেছে।

তা’ সত্ত্বেও তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় বসেই কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার এই মামলায় দিল্লি পুলিশকে একই অভিযোগে ইউপিএ ধারা প্রয়োগ করে আরও কঠোরভাবে কণ্ঠরোধের প্রয়াস শুরু করলো। আগের ধারা গুলিতে অভিযোগ প্রমাণিত হলে দুই থেকে তিন বছরের সাজা হতে পারতো। কিন্তু ইউএপি-এর ধারা ১৩ প্রয়োগ করে সাত বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে। তাছাড়া, এই ইউএপিএ-তে সাধারণভাবে জামিনের সুযোগ নেই। ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল, এই বছর গুলিতে এই আইনে আটক ২৪ হাজার ব্যক্তির ৯৭ শতাংশ জেলবন্দি হয়ে আছে। অথচ, অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে মাত্র ২১২ জনের। বিনা বিচারে জেলে আটক রাখার সুযোগ নেওয়ার জন্যই, একটি অতি চর্চিত বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য অরুন্ধতী রায় ও অধ্যাপক শওকত হোসেন এর বিরুদ্ধে ইউএপিএ প্রয়োগ করা হয়েছে।

সরকারের এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন দেশের বহু মানুষ। দিল্লির উপরাজ্যপাল বিনয় কুমার স্যাক্সেনার অনুমতি সাপেক্ষে দিল্লি পুলিশ ইউএপিএ লাগু করে সমালোচনামূলক ভাবনা চিন্তা দমনের আর-এক নতুন অধ্যায় শুরু করলো। অথচ, এর আগে মহারাষ্ট্রের ভীমা কোরাগাঁও ও অন্যান্য ইউএপিএ মামলায় যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁদের প্রায় অনেককেই প্রমাণের অভাবে জামিন বা বেকসুর খালাস করতে বাধ্য হয়েছে আদালত। এদের অনেকের বিরুদ্ধেই ইউএপিএ এর বিভিন্ন ধারার মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। কিন্তু ৪ থেকে ১১ বছর জেল যাপনের পর এঁদের সকলকেই আদালত মুক্তি দিয়েছে।

বিশিষ্ট কবি-প্রাবন্ধিক সমাজ কর্মী ও কমিউনিষ্ট বিপ্লবী শিবিরের ঘনিষ্ঠ ভারভারা রাও, অধ্যাপক সোমা সেন, আইআইটি-অধ্যাপক আনন্দ তেলতুম্বলে, রোণা উইলসন, সুরেন্দ্র গ্যাডগিল, সাংবাদিক গৌতম নওলখা, আইনজীবী ও আদিবাসীদের আইনি লড়াইয়ের সাথী সুধা ভরদ্বাজ সকলকেই মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। ৮৪

বছরের ফাদার স্ট্যান স্বামীকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আইনি ও সামাজিক অধিকার নিয়ে সোচ্চার হওয়ার অপরাধে গ্রেফতার করে জেল হেফাজতে বিনা চিকিৎসায় ২০২১ সালে হত্যা করার অভিযোগে উঠেছে। ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী অধ্যাপক জি এন সাইবাবাকে ১১ বছর জেলে কাটাতে হয়েছিল। সরকারের যুক্তি ছিল, তাঁর শরীর অকেজো হলেও মস্তিষ্ক সচল এবং বিপদজ্জনক ! বিজেপি সরকার মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে কতটা ভয় পায় এই ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাই আদালত একাধিকবার ইউএপিএ ধারা প্রয়োগের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছে।

সুপ্রিম কোর্ট ২০২২ সালে বিজেপি সরকারের অতি প্রিয় দেশদ্রোহী আইন নিয়ে প্রশ্ন তুলে সংযমী হতে বলেছে। কিন্তু এবারেও বিজেপি'র খঞ্জ সরকার গণ আদালতে ধাক্কা খেয়েও ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত জীবনের অধিকার, ন্যায় বিচারের অধিকার, বাক্ স্বাধীনতার অধিকার হরণ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। সংবিধানে ১৯ নং ধারায় মত প্রকাশের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও তা' মানতেও বিজেপি সরকারের প্রবল আপত্তি। আসলে, বিজেপি-আরএসএস এবং ভারতের মুখ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল কাশ্মীর নিয়ে দমন-পীড়নকেই একমাত্র হাতিয়ার বলে মনে করছে। কাশ্মীরের নাগরিকদের উপর জুলুম অব্যাহত। কাশ্মীর টাইমসের সম্পাদক সুজাত বুখারির মত সাংবাদিকদের খুন হতে হচ্ছে। তাঁদের বিদেশে যেতে নির্লজ্জ ভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছরে কাশ্মীরের এক ডজন নাগরিক সংবাদ মাধ্যম থেকে নানা অজুহাতে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। কারণ, তাঁরা কাশ্মীরের প্রকৃত অবস্থা ভারত ও বহির্বিশ্বে জানিয়ে দিতে পারে, এই আশঙ্কায়।

১৪ বছর আগে একটা সেমিনারে বক্তব্য রাখার জন্য আজ অরুন্ধতী রায় ও শওকত হোসেনের বিরুদ্ধে তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসেই মোদি সরকার ইউএপিএ ধারা লাগিয়ে কণ্ঠরোধ করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। অথচ ওই বক্তব্য দেশে বা কাশ্মীরে কোনও সমস্যা তৈরি করেছিল এমন তথ্যও নেই।

ভারত জুড়ে জল-জঙ্গল-জমি লুট করছে কর্পোরেট কোম্পানিগুলো। ঝাড়খন্ডের রাজধানী শহর রাঁচির লাগোয়া বনভূমি থেকে কয়েক হাজার আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদ করে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা কর্পোরেটের হাতে হাজার হাজার একর জমি তুলে দিয়েছে। ছত্তিশগড়ে বালাঘাটা, নারায়ণপুর, শ্যাডল ও বস্তার জেলার মূল্যবান বন ও খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনে মরিয়া দেশি বিদেশি কর্পোরেটগুলি। সরকারের নির্দেশে তাই স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও প্রান্তিক-দরিদ্র মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আধা সামরিক বাহিনী। এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১৪০ জন মানুষের। এদের সকলকেই মাওবাদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে এটা ঠিক আদিবাসীদের উচ্ছেদ, ঝুপড়িতে অগ্নিসংযোগ, মারধোর এমনকি ধর্ষণের ঘটনায় যতটুকু প্রতিরোধ তা' গড়ে উঠেছে মাওবাদীদের নেতৃত্বে। তাই সেই প্রতিরোধের মুখে পড়ে এখন অবুঝমাড় সহ ছয়টি অঞ্চলে ড্রোনের সাহায্যে বোমা মেরে আদিবাসীদের হত্যা করা হচ্ছে। ঘটনা স্থলের কাছাকাছি গ্রামগুলোতেও সংবাদ মাধ্যমের কর্মী ও মানবাধিকার সংগঠনের কর্মীদের ঢুকতে বাধা দিচ্ছে পুলিশ। একাধিক সংবাদ মাধ্যমকে পুলিশের বয়ান অনুযায়ী খবর লিখতে বলা হয়েছে। ডিএভিপি বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে জোর করে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশে বাধ্য করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। কলকাতার একটি স্বল্প প্রচলিত দৈনিক বিজ্ঞাপনের লোভে মাওবাদী বা আদিবাসীদের মৃত্যু হলে লেখে খতম। আর আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান মরলে লেখে শহীদ। এরা অধিকাংশই মোদি ও মমতার প্রসাদ খেকো মিডিয়া। অরুন্ধতীর উপর এই আক্রমণ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাহুল গান্ধী এখনও নিরব। কারণ, রাষ্ট্রের স্বরূপ আড়াল করতে সংসদীয় দলগুলোর তৎপরতা সমান। এই নিরাবতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে নাগরিকরা। অরুন্ধতী রায় ও শওকত হোসেনের বিরুদ্ধে ইউএপিএ লাগু করার প্রতিবাদে দেশব্যাপী প্রতিবাদ হচ্ছে। এপিডিআর ২৫ জুন প্রতিষ্ঠা দিবসে মধ্য কলকাতায় ধিক্কার সভা করে।

আসল কথা, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে কর্পোরেটের স্বার্থে রাষ্ট্রের এই হামলার বিরুদ্ধে ও সংবিধানের বুনিয়াদি অধিকার রক্ষার প্রশ্নে অরুন্ধতীর লেখনী ও বক্তব্য সরকারের আশঙ্কার কারণ। একদিকে নিট নিয়ে চরম দুর্নীতি। ৭২০তে ৭২০ পেয়ে ৬৭ জন টপার। একটি ঘরে বসে পরীক্ষা দিয়ে ৭ জন টপার। অন্যদিকে ২০২২ থেকে ২০২৪ (১৭ জুন পর্যন্ত)২৩টি ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩৭১জনের। নিট কেলেঙ্কারি ও রেল দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যুর মতো বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে মোদি সরকারের অপদার্থতা ও অক্ষমতা নিয়ে চর্চা যাতে রাষ্ট্রের মূল কাঠামোকে বিপন্ন করে না-তোলে তা' আটকাতেই নাগরিক সমাজের অগ্রণী অংশকে জেলে আটকে রাখার চেষ্টা। শাসক দলগুলি জানে, শেষ বিচারে সচেতন নাগরিক সমাজই সরকারের বিপদ ডেকে আনে। সেই বিপদের গন্ধেই, শুরু

থেকে আক্রমণাত্মক আরএসএস-বিজেপির হিন্দুত্ববাদী সরকার। ওরা জানে, দেশের মানুষের বিরুদ্ধে সরকার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লে সবাই চুপ করে থাকলেও নাগরিক সমাজের নির্ভিক সচেতন কলম চুপ করে থাকবে না। তাই টার্গেট অরুন্ধতী ও শওকত হোসেন-এর মত মানুষরা।

নতুন ডাক আইনে রাষ্ট্রীয় নজরদারির সর্বাত্বক অধিকার

রঞ্জিত শূর

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ইন্ডিয়ান পোষ্ট অফিস অ্যাক্ট ১৮৯৮ বাতিল করে নতুন আইন এনেছে। আইনের নাম 'দ্য পোষ্ট অফিস অ্যাক্ট-২০২৩। অনেক পরিবর্তনের মধ্যে নতুন আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরী। এই আইনে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার চাইলে ডাকে পাঠানো যে কোনও চিঠি বা ডকুমেন্ট বা প্যাকেট—সমস্ত কিছু খুলে দেখতে পারবে। বলা হয়েছে, ক) রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় , খ) বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষায়, গ) জনজীবনে শৃঙ্খলা, ঘ) জরুরী পরিস্থিতি, ঙ) সাধারণের নিরাপত্তা, চ) অন্য কোনও আইন ভাঙা বা কোনও আইনের কোনও ধারা লঙ্ঘন করেছে মনে করলে যে কোনও আর্টিকেলই খুলে দেখার অধিকার থাকবে।

শান্তি রক্ষায় ব্রিটিশ আমলের, ১৮৯৮ সালের পুরনো আইনেও চিঠিপত্র খুলে দেখতে পারতো সরকার। কিন্তু সেখানেও কিছু বাধা নিষেধ বা পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু এবারের আইনে এমন কোনও বাধা নিষেধ বা পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণ নেই। কেন্দ্রীয় সরকার আদেশ জারি করে একজন অফিসারকে এই দায়িত্ব দিলেই তিনি যে-কোনও চিঠি-পত্র, দলিল দস্তাবেজ খুলে দেখতে পারবেন।

নিয়ন্ত্রণহীন নজরদারি চালানোর অধিকার, নাগরিকদের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং মতপ্রকাশের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে। ১৯৯৬ সালে সুপ্রিম কোর্ট টেলি - কমিউনিকেশন বিভাগের এরকম নজরদারি বিষয়ে একটি মামলায় সুস্পষ্ট মত দিয়েছিল যে— এরকম নিয়ন্ত্রণহীন নজরদারি সংবিধানের ১৯ নম্বর এবং ২১ নম্বর ধারা লংঘন করে।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, নজরদারি চালানোর জন্য ক) প্রত্যেকটি নজরদারি আদেশ রিভিউ কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। খ) প্রত্যেকটি নজরদারির আদেশ উচ্চপদস্থ অফিসারদের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। গ) নজরদারির সংখ্যা ন্যূনতম হতে হবে। ঘ) কেন নজরদারি তার যুক্তিসম্মত কারণ দেখিয়ে তা' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বর্তমান আইনে কিন্তু কোনও বাধা নিষেধ রাখা হয়নি। বৃটিশ আইনে কিছু বাধা নিষেধ ছিল। প্রসঙ্গত ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার নজরদারির অবাধ ক্ষমতা দিয়ে একটা আইন পাশ করিয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জৈল সিং তাতে স্বক্ষর না-করে ফেলে রেখেছিল। পরে ২০০২ সালে বিজেপি সরকার এসে তা' বাতিল করে দেয়। আজ কংগ্রেসি সরকারের মত একই ধরণের অবাধ ক্ষমতা দিয়ে আইন পাশ করেছে বিজেপি সরকার। আরও কঠিন ধারা তা'তে যুক্ত হয়েছে। সংবিধান বর্ণিত অধিকার, সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণ বা বিধি নিষেধ সব কিছুকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সেই আইন বলবৎ করলো কেন্দ্রের বিজেপি-আরএসএস নিয়ন্ত্রিত সরকার। নতুন আইনে বলা আছে, জরুরী পরিস্থিতিতে সরকার যে-কোনও আর্টিকেলই খুলে দেখতে পারবে। ১৯৬৮ সালে আইন কমিশন এই প্রশ্ন বিচার করে বলেছিল, শুধু জরুরী অবস্থা বা জরুরী পরিস্থিতি বললে কিছুই বোঝা যায় না। এর ব্যাপ্তি বিরাট। ফলে সরকারকে অনেক বেশী ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে। আইন কমিশন বলেছিল কোনও পোষ্টাল আর্টিকেলে নজরদারি চালানো হলে ব্যক্তির মত প্রকাশের অধিকার সংকুচিত হয়, কেড়ে নেওয়া হয়। কারণ ডাকে যায় চিঠি-পত্র, বই পোষ্ট কার্ড, খবরের কাগজ ইত্যাদি। আইন কমিশন আরও বলেছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা বা সংবিধান বর্ণিত জরুরী অবস্থা সৃষ্টি না-হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জরুরী পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে পোষ্টাল আর্টিকেলে নজরদারি চলতে পারে না।

নতুন এই আইনে আরও দু'টো মারাত্মক দিক আছে। বলা হয়েছে, কোনও ডাক গ্রাহকের কোনও আর্টিকেলের ক্ষতির জন্য ডাক বিভাগ কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না। বৃটিশ আইনেও ক্ষতিপূরণ ছিল না। ২০০৩ সালে কনজিউমার'স কোর্ট নির্দেশ দিয়ে বলেছিল, ডাক বিভাগের গ্রাহকরা কনজিউমার নয়। ফলে, তারা ক্ষতিপূরণ পেতে পারে না। অথচ, রেলে মাল পাঠালে ক্ষতি হলে তার জন্য ক্ষতিপূরণ পায় গ্রাহক। নতুন আইনে বলা হয়েছে, কাজ করতে গিয়ে কোনও আর্টিকেলের ক্ষতির জন্য কোনও ডাক কর্মীকে সাজা দেওয়া যাবে না। একমাত্র জালিয়াতি বা ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধন করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। কিন্তু কোনটা

জালিয়াতি বা কোনটা অনিচ্ছাকৃত বোঝা যাবে কী করে? উত্তর নেই আইনে!

প্রতিবেদন

রাজনৈতিক বন্দির চিকিৎসায় অবহেলা

মেদিনীপুর জেলে বন্দি আছেন কল্পনা মাইতি। শিলদা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দি।

সম্প্রতি জেলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তাররা তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। জেল কর্তৃপক্ষ সেই পরামর্শ উপেক্ষা করে। বলে, ভোটের জন্য ফোর্স নেই, হাসপাতালে নেওয়া যাবে না। এরপর ডাক্তার কিছু ওষুধ লিখে দেয় এবং দ্রুত সে ওষুধ খেতে বলে। কিন্তু সে ওষুধও তাঁকে দেওয়া হয়নি। বলে, ওষুধ নেই। পাওয়া যাচ্ছে না। পরিবার মারফত এ-খবর আসে এপিডিআর এর কাছে। এপিডিআর সঙ্গে-সঙ্গে একজন মহিলা রাজনৈতিক বন্দির সঙ্গে এরকম আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। আইজি প্রিজনকে চিঠি লিখে বন্দির মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনে। অবিলম্বে কল্পনাকে হাসপাতালে ভর্তি করে তার চিকিৎসা শুরুর দাবি জানায়। অভিযোগ জানানো হয়, মানবাধিকার কমিশনেও। দ্রুত নড়েচড়ে বসে জেল কর্তৃপক্ষ। ওষুধ দিতে শুরু করে। মেদিনীপুর জেল কতৃপক্ষের তরফে এপিডিআর-কে ফোন করে জানায় যে কল্পনার ওষুধ চালু হয়ে গেছে। এরপর তৎপরতার সঙ্গে তাঁকে মেদিনীপুর হাসপাতালে ভর্তি করে। তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়েছে। এপিডিআর কর্মীরা তাঁর চিকিৎসায় নজর রাখছে।

রাজনৈতিক বন্দির বদলির দাবি

জেলবন্দিদের বাড়ির কাছের জেলে রাখতে হবে, যাতে পরিবারের লোকজন, আত্মীয় স্বজনরা এসে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারে। এই নিয়ম আন্তজার্তিক ভাবেই স্বীকৃত। ম্যান্ডেলা রুলসেও আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই নিয়মটি বারবার লঙ্ঘন করে।

শিলদা মামলায় বন্দি প্রশান্ত পাত্রের বাড়ি ঝাড়গ্রামে। অথচ তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়েছে বালুরঘাট জেলে। এটা অন্যায়। প্রশান্ত জেলে মনরোগে আক্রান্ত। আগের দফায় বন্দি থাকাকালীন বেশ কিছুদিন পিজি হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগে ভর্তিও ছিলেন। মানসিক অবসাদ থেকে বার কয়েক আত্মহত্যারও চেষ্টা করেছেন। এরকম একজন অসুস্থ বন্দিকে বাড়ি থেকে বহুদূরে বন্দি করে রাখা চরম অমানবিক, নিষ্ঠুরতা।মানবাধিকার হরণ। এপিডিআর বন্দির পরিবারের সঙ্গে কথা বলে প্রশান্ত পাত্রকে মেদিনীপুর বা ঝাড়গ্রাম জেলে বদলির জন্য আইজি প্রিজনের কাছে লিখিত দাবি জানিয়েছে। বালুরঘাট জেল কর্তৃপক্ষকেও বলা হয়েছে বন্দির শারীরিক মানসিক অবস্থার দিকে বিশেষ নজর রাখতে। হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছে, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কাছেও।

আলিপুরদূয়ার অবশেষে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হল প্রশাসন

২৪ জুন, ২০২৪, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (আলিপুরদুয়ার শাখা)'র নেতৃত্বে কয়েক'শ গ্রামবাসী তাদের কয়েক পুরুষের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদের চক্রান্তের প্রতিবাদে মিছিল করে জেলাশাসকের অফিসে গিয়েছিল ডেপুটেশন দিতে। আগে থেকে প্রশাসনকে সমস্ত জানানো ছিল। কিন্তু, চাষাদের দাবি শোনার মত ইচ্ছে বা সময় হয়ে ওঠেনি জেলাশাসকের অফিসের অফিসারদের।

আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্ভুক্ত শ্রীনাথপুর চা বাগান সংলগ্ন তিনটি গ্রামের প্রায় দু'শো পরিবার। তাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলে যে জমিতে চাষবাস করে, সেই জমি থেকে তাদের যেন-তেন প্রকারে উচ্ছেদ করতে উঠে পড়ে লেগেছে চা বাগান কর্তৃপক্ষ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তারা কয়েক পুরুষ ধরে এই জমির ওপর নির্ভরশীল। এতদিন কেউ তাদের জমি চাষে বাধা দেয়নি। নতুন এক ম্যানেজার এসে নতুন ফরমান জারি করেছেন যে এই জমি না-কী চা বাগানের, অতএব, এখানে তারা আর চাষের প্রয়োজনে আসতে পারবে না। মাঠে যাবার চেষ্টা করলেই, বাগানের কর্মীদের দিয়ে তাদের আটকে দেওয়া হয়, নানারকম হুমকি ও ভুয়ো মামলা করা হয়।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, কৃষককে তার জমিতে পাট্টা দেওয়ার কথা। সেই দাবি নিয়ে আজ এপিডিআর আলিপুরদুয়ার শাখার নেতৃত্বে কৃষকেরা ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু জেলাশাসকের অফিস থেকে ডেপুটেশন নিতে অস্বীকার করা হয়।

এপিডিআর আলিপুরদুয়ার শাখার নেতৃত্বে কৃষকেরা

অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবস্থানে বসেন। তাদের উঠিয়ে দেওয়ার জন্য লাঠিচার্জের ভয় দেখানো হয়। অবশেষে তাদের অনড় মনোভাবের কাছে নতি স্বীকার করে ডেপুটেশন নেয় জেলাশাসকের অফিস। আশ্বাস দেয় সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে।

উত্তরবঙ্গের পথে স্লোগান ওঠে, জমির অধিকারের জন্য কৃষকের লড়াইয়ের পাশে এপিডিআর আছে, থাকবে।

আগামীকাল ২৫ জুন, তিপ্পান্ন তম জন্মদিন এপিডিআর-এর। গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দিন। সেই মহেন্দ্রক্ষণের পুর্ব্ব দিনে আলিপুরদুয়ার শাখা তার এক নতুন সংগ্রামের সূচনা করলো।

শিলদা মামলা

২৭/২/২০২৪ তারিখে মেদিনীপুর সেশন ট্রাইল কোর্টে Session Trial Court পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাসে এক ভয়াবহ নজিরবিহীন রায় ঘোষণা করে কেস নাম্বার ১১ (০৯) ২০১১। ঐ মামলায় অভিযুক্ত ২৩ জন রাজনৈতিক বন্দিকেই যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয়। এদের মধ্যে দুইজন মহিলা রাজনৈতিক বন্দিঃ কল্পনা মাইতি ও ঠাকুর মণি হেমব্রম।

U/S 121/121A/122/124A/302/120B of IPC 1860
U/S 16(1)(a)/18/20/38/39 of the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967
U/S 3&4 of the Explosive Substance Act– 1908
U/S 25 (1AA) and 27(3) of the Arms Act– 1959.

১৫/২/২০১০ সালে বিকেল পাঁচটা দশ থেকে পাঁচটা পনের মিনিটের মধ্যে ৭০ থেকে ৮০ জন মাওবাদী আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পরিকল্পিতভাবে শিলদা ইফ এফ আর ক্যাম্পে হামলা চালায় এবং ২৪ জন তাতে মারা যান ও তাদের অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠিত হয়- এই মর্মে ওই ক্যাম্পেরই হাবিলদার নারায়ণ ছেত্রী বিনপুর পুলিশ ষ্টেশনে এফ আই আর করেন (১২/২০১০)। দীর্ঘ ১৪ বছর মামলাটি চলেছিল। এই ঘটনার পেছনে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ না-থাকা সত্ত্বেও (যে সাক্ষী ছিল সেগুলি সবই পুলিশের সাজানো মিথ্যা সাক্ষ্য) মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেট ঐ রায় ঘোষণা করেন যা' গণতন্ত্রের পক্ষে লজ্জার কলঙ্কের।

যে-দিন এই মামলার রায় ঘোষণা হয় সে-দিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন জয়শ্রী পাল ও প্রবীর রায় রাজারহাট শাখা ও তাপস'দা উত্তর পূর্ব কলকাতা শাখার। রায় ঘোষণা হবার সঙ্গে-সঙ্গে যারা জামিনে ছিলেন, যেমন অর্ণব দাম, ধৃতিরঞ্জন মাহাতো, আশীষ মাহাতো, রামসায়ী হাসদা, প্রশান্ত পাত্র এমন-কী গুরুতর অসুস্থ বুদ্ধদেব মাহাতো, সবাইকেই পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে ও কাস্টঁডি-তে নেয়। রায় ঘোষণার দিন মেদিনীপুর কোর্টেও ছিল অভূতপূর্ব পুলিশী বন্দোবস্ত। আদালতকে চত্বর পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। কোনও মানবাধিকার সংগঠনের কর্মী বা রিপোর্টার কাউকে কোর্ট রুমে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। মেদিনীপুর আদালত, ওপেন কোর্ট হওয়ায় সত্ত্বেও সেখানে সমস্ত সাধারণ মানুষেরই কোর্ট রুমে ঢোকার অধিকার থাকে। আদালত থেকে বেরোবার সময় মনসারাম হেমব্রমকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি জানান, এটি একটি নজিরবিহীন রায়! তাঁরা এমন রায় প্রত্যাশাও করেননি! এর বিপক্ষে তাঁরা উচ্চ আদালতে আবেদন করবেন এবং এটি যে একটি সাজানো রাজনৈতিক মামলা সেটিও তিনি ব্যক্ত করেন।

বন্দির বাড়ির লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই কান্নায় ভেঙে পড়েন কিন্তু বন্দিদের মানসিক দৃঢ়তা উপস্থিত সব মানুষকে অবাক করে দেয়। তারা বলেন এই সরকারের থেকে তারা এর থেকে বেশি প্রত্যাশাও করেন না এবং এর বিরুদ্ধে তারা উচ্চ আদালতে যাওয়ার জন্য তৈরি। এত বড় সাজা ঘোষণা এর আগে কখনও দেখেনি পশ্চিমবঙ্গবাসী। স্বাভাবিকভাবেই নিউজ চ্যানেলগুলি এই খবর সম্প্রসারণ করতে শুরু করে শুরু করে দেয়।

আদালত পরের দু'দিন অর্থাৎ ২৮ শে ফেব্রুয়ারি এবং ২৯ শে ফেব্রুয়ারি সাজা ঘোষণার দিন ধার্য করে। প্রথম দিন ১৩ জনকে এবং পরের দিন বাকিদের সাজা ঘোষণা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথম দিন যাদের সাজা ঘোষণা করা হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন কল্পনা মাইতি, ঠাকুর মণি হেমব্রম, কানাই হাসদা, মানস মাহাত, সনাতন সরেণ প্রমুখ। বিচারক তাদের আমৃত্যু জেল-এর সাজা শোনান।

বন্দির বাড়ির লোক কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়লেও অনেকে এমন কথাও ব্যক্ত করেন যে, এরপর থেকে আসল লড়াই শুরু হল। এই মামলার আইনজীবী ছিলেন অলক মন্ডল, অজিত মল্লিক, দেবাশীষ ভট্টাচার্য। তাঁরা সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তাঁরা নিজেদের পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। অবশ্যই এরপরে তাঁরা বলেন যে, আসলে মামলাটির রায় হয়েছে রাজনৈতিক। সাক্ষী, সাওয়াল-জবাব-এর উপর ভিত্তি করে যদি এই বিচার প্রক্রিয়া পরিচালিত হতো তাহলে এই সাজা হতো না। কারণ, বেশিরভাগ সাক্ষী ছিলেন সাজানো ও

পুলিশের লোক। সেদিন এপডিআর থেকে আদালতে উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট শাখার জয়শ্রী ও কৃষ্ণনগর শাখার অমিতাভ সেনগুপ্ত। সেদিনও আদালত কক্ষ পুলিশি চাদরে মুড়ে ফেলা হয় এবং কোনও সাংবাদিক বা মানবাধিকার কর্মীকে আদালত কক্ষ ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

পরের দিন ২৯ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ বাকি ৯ জনের সাজা ঘোষণা করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন সেই সব বন্দি যারা এতদিন হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়ে বাইরে ছিলেন । যেমন অর্ণব দাম, ধৃতি রঞ্জন মাহাতো, প্রশান্ত পাত্র, রামসাই হাসদা প্রমুখ। সবাই আশা করেছিল আজ হয়তো বিচারক অন্য রকম সাজা শোনাবেন। কারণ, প্রথমতঃ এদের অনেকে জামিনে ছিলেন, আর দ্বিতীয়তঃ কোনও-কোনও বন্দি আছেন যাঁদের কোন সাক্ষীই চিহ্নিত করেনি। কিন্তু সকলকে অবাক করে বিচারক সকলের জন্য একই সাজা বহাল রাখেন, মানে যেসব বন্দিকে একজন ও সাক্ষী চিহ্নিত করেনি তাঁদেরও যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করা হয়। হায় বিচার ব্যবস্থা ! !

এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে অভিযুক্ত অর্ণব দাম বলেন যে ‘‘এই রায় সম্পূর্ণভাবেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত শুধুমাত্র রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থ করার জন্যই এই রায় ঘোষণা করা হলো’’। কোর্টরুমে ঢুকতে না-পারলেও পরে বন্ধুদের মুখে শোনা গেছে যে, বিচারক নিজে বলেছেন, ‘‘আমার কিছু করার ছিল না, উচ্চ আদালতে গেলে সবাই জামিন পাবেন’’। বন্ধুদের মুখে এ কথা শুনে মনে হয়, কখনও-কখনও বিচারকরা'ই কত অসহায়! এপিডিআর এই রায়ের বিরোধিতা করে। এবং শিলদা মামলার বিচার যে, বিচার ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করেছে; তাও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

রিপোর্ট

মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি

ছত্তিশগড়ের জনসাধারণের পাশে দাঁড়ান।

ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা, ড্রোন থেকে আকাশ পথে বোমাবর্ষণ করে নিজ নাগরিকদের বিরুদ্ধে ভারত রাষ্ট্রের যুদ্ধের বিরোধিতা করুন।

৫ই মে, ২০২৪ বহরমপুরের টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে ছত্তিশগড়ে ভুয়ো সংঘর্ষের নামে মাওবাদী রাজনৈতিক কর্মী ও আদিবাসীদের গণহত্যার বিরুদ্ধে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

এই সভা বহরমপুর শাখার সদস্য টুম্পা ঝাঁর বক্তব্য ও একটি প্রতিবাদী গণসংগীত দিয়ে শুরু হয়। সভাটিতে বহরমপুর শাখার সদস্য ছাড়াও বহরমপুর শহরের সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিল এনআরসি বিরোধী সংহতির সদস্যবৃন্দ। বহরমপুর শহরের ব্রীহি সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে নাট্য নির্দেশক দীপক বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক গোলাম মোঃ আজাদ, সহ-সম্পাদক আব্দুল গনি, বহরমপুর শাখার সদস্য রাজীব রায়।

সভাটিতে বহরমপুর শাখার সদস্যরা ছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন শাখা থেকে সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। ছত্তিশগড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নিয়ে তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সম্পাদক মৌতুলি নাগ সরকার ও কৃষ্ণনগর শাখার সদস্য অমিতাভ সেনগুপ্ত। মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ছত্তিশগড়ের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে কেন্দ্র করে একটি প্রচার পত্র পথ চলতি সমস্ত মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়। এছাড়াও প্রোগ্রামে ছত্তিশগড় নিয়ে পোস্টার প্রদর্শন করা হয়। সভা সঞ্চালনা করেন জেলা কমিটির সদস্য ও কান্দি শাখার সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সরকার।

কান্দি শাখা, মুর্শিদাবাদ

কর্পোরেটের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় হামলার বিরুদ্ধে ছত্তিশগড়ের জনসাধারণ ভুয়ো সংঘর্ষে ছত্তিশগড়ে রাষ্ট্রীয় গণহত্যা ও প্রখ্যাত লেখিকা, সমাজকর্মী অরুন্ধতী রায় ও শওকত হোসেনের বিরুদ্ধে কালা কানুন ইউএপিএ দিয়ে কারারুদ্ধ করার রাষ্ট্রীয় প্রতিহিংসা মূলক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সকলকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান রেখে প্রতিবাদী সভা করে মুর্শিদাবাদের এপিডিআর কান্দি শাখা।

গত ২২ শে জুন বিকাল পাঁচটা থেকে কান্দির বিশ্রামতলায় ব্যাপক মানুষের সমাগমে ভুয়ো সংঘর্ষে ছত্তিশগড়ে মাওবাদী রাজনৈতিক কর্মী ও আদিবাসীদের গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সভা করে এপিডিআর কান্দি শাখা। বক্তব্য সহ সঙ্গীত পরিবেশন করেন, টুম্পা ঝাঁ, গোলাম মহম্মদ আজাদ, প্রবাদ সিংহরায়, ইন্দ্রজিৎ সরকার, পলাশ সরকার, জয়দেব দাস।

ইজরাইলে ভারতীয় শ্রমিক পাঠানোর বিরুদ্ধে নাগরিক সভা

ইজরাইলে ভারতীয় শ্রমিক পাঠানোর বিরুদ্ধে এবং শ্রমিক পাঠানোর জন্য মোদি-নেতানিয়াহু চুক্তি বাতিলের দাবিতে ২৪শে মে, ২০২৪ কলকাতার ত্রিপুরা হিতসাধনী সভা হলে এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এপিডিআর এর কলেজ স্ট্রিট শাখা (প্রস্তুতি কমিটি) এই সভার আয়োজক ছিল। সভায় আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক কমল তেওয়ারি এবং অধ্যাপক ও গবেষক সমতা বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন কলেজ স্ট্রিট শাখা প্রস্তুতি কমিটির সদস্য ডঃ শামসুল আলম।

কমল তেওয়ারি তার বক্তব্যে ভারতবর্ষের শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তিনি বিভিন্ন কারখানার উদাহরণ তুলে ধরে দেখান কিভাবে আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের অধিকারগুলো কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ইউনিয়নগুলো ন্যূনতম প্রতিবাদও করে না। ন্যূনতম মজুরি, ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবস, কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিরাপত্তা—এগুলো সবই বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় শ্রমক্ষেত্রে আজ কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে দেখান শ্রমকোডের মধ্যে বিরুদ্ধে আন্দোলন তৈরি হলো না। কারণ, তার বাস্তবতাই নেই। তাঁর মতে, শ্রমিকদের খুব ক্ষুদ্র একটা অংশই সংগঠিত ক্ষেত্রে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। শ্রমকোড তো মূলত স্থায়ী শ্রমিকদের জন্য। অসংগঠিত ক্ষেত্রে বা ঠিকা অস্থায়ী কর্মীদের তো কোন কোডই কাজে লাগে না। তাদের ক্ষেত্রে কার্যত কোনও আইন কানুনই লাগু হচ্ছে না। তারা এমনিতেই প্রচণ্ড খারাপ অবস্থার মধ্যে, খারাপ পরিবেশে কাজ করে। শ্রমিকদের কাছে ভাবনাটা এরকম যে এখানে-তো আমরা মরেই আছি, কাজেই ইজরাইলে গিয়ে নতুন আর কী ক্ষতি হবে! কতটা আর খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে আমরা পড়বো! বরঞ্চ অনেক টাকা রোজগার করতে পারব, পরিবারকে কিছুটা ভালো রাখতে পারব। এই মানসিকতার জায়গা থেকেই শ্রমিকরা ইজরাইলে যাওয়ার জন্য লাইন দিচ্ছে। তিনি এর বিরুদ্ধাচারণ করেন। কিন্তু আজকে এই মুহূর্তে এর বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না বলে তার মত। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন গুলি বা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে লাভ নেই। তারা কিছু করবে না। এরকম একটা বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তিনি এপিডিআরকে ধন্যবাদ জানান। এবং আগামী দিনে এ ধরনের যে-কোনও আলোচনা বা চর্চায় তাকে ডাকলে সব সময় পাওয়া যাবে এই আশ্বাস দেন।

অধ্যাপক সমতা বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি বলেন, ইজরাইলে ১ লক্ষ শ্রমিক পাঠানো হবে। দফায়, দফায়। কয়েক হাজার শ্রমিক ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে। তিনি তাঁর প্রাণবন্ত বক্তব্যে দেখান, কী-ভাবে দীর্ঘকাল ধরেই বিদেশে শ্রমিকরা কাজে যাচ্ছে কিন্তু আজও এব্যাপারে কোনও ফ্রেম ওয়ার্ক তৈরি হয়নি। কী বেতনে বা শর্তাবলীতে শ্রমিকরা ইজরাইলে যাচ্ছে, কবে থেকে যাওয়া শুরু হয়েছে, কী চুক্তি হয়েছে, সমস্ত বিষয়টাই তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশে ভারতীয় শ্রমিকরা যায়, কাজ করে। আরব দেশে ভারতীয় শ্রমিক কাজ করে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও কাজ করে। কিন্তু এইভাবে সরকারি উদ্যোগে চুক্তি করে শ্রমিক পাঠানো আগে কখনও হয়নি। সেদিক থেকে এটা একটা বিশেষ পরিস্থিতি যা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার দাবি রাখে। এভাবে ভারতীয় শ্রমিকদের সরকারি উদ্যোগে পাঠানো হচ্ছে এইটা তাঁর কাছে উদ্বেগ জনক বলে মনে হয়েছে। কারণ, দেশে যথেষ্ঠ কাজ যে তৈরি হবে-না আগামীতেও, এটা এই ঘটনায় বোঝা যায়। এবং আলোচনা থেকে এটাও উঠে আসে যে এটা আসলে অন্যভাবে ইজরাইল প্যালেস্টাইন যুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ। কারণ এই শ্রমিকরা ঐখানে গিয়ে মূলত কনস্ট্রাকশনের কাজ করবে। সেটা সেনা ব্যারাকও হতে পারে। এছাড়া যাবে বহু নার্স অর্থাৎ যুদ্ধে আহত শ্রমিকদের সেবা করবে অথবা সেনা হাসপাতাল তৈরি করাবে ভারতীয় শ্রমিকদের দিয়ে। এভাবে এই যুদ্ধের অংশ করে দেওয়া হবে ভারতের শ্রমিক শ্রেণিকে। এর বিরুদ্ধে সভা থেকে তীব্র আওয়াজ ওঠে।

শেষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আরও বড় মাপের এ ধরণের আলোচনা করার দাবি উঠে আসে। সভায় প্রশ্ন আসে শ্রমিকরা ইজরাইলে যাচ্ছেন তার জন্য লাইন দিচ্ছেন। এটা যেমন ঠিক, কিন্তু এ-ও ঠিক যে, এর জন্য ভারত সরকারকে উদ্যোগ নিতে হচ্ছে এবং সরকারকে চুক্তি করতে হচ্ছে। ভারত সরকারকে উদ্যোগী হয়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করে পাঠানোর চেষ্টা করতে হচ্ছে, এটা কেন! এবং তথ্য হিসেবে দেখা যাচ্ছে তাইওয়ানেও আরও এক লক্ষ শ্রমিক যাবে। ইটালিতে কুড়ি হাজার শ্রমিক যাবে; সরকারি চুক্তির মাধ্যমে। সরকার সংগঠিতভাবে শ্রমিক পাঠাচ্ছে এমনটা অতীতে কখনও হয়নি। তাই এই পরিস্থিতি

আরও সিরিয়াস আলোচনার দাবি রাখে। এপিডিআর এর সংগঠকরা পরবর্তীকালে রাস্তায় নেমে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।

সোনারপুর শাখা

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর) সোনারপুর শাখা দীর্ঘদিন ধরে সোনারপুর ব্লক ও রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা এলাকায় মানবাধিকার, মানুষের বাক-স্বাধীনতা ও মত-প্রকাশের অধিকার, বিভিন্ন নাগরিক অধিকার ও প্রাকৃতিক পরিবেশরক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে। এছাড়া বর্তমান হিন্দুত্ববাদী শাসকদের সাম্প্রদায়িক বিভেদে সৃষ্টির চক্রান্তমূলক কার্যক্রম CAA-NRC-প্রতিরোধ আন্দোলনেও শাখা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

এই ধারাবাহিকতায় গত ৪ এপ্রিল, ২০২৪ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর) সোনারপুর শাখার উদ্যোগে এ পি ডি আর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সহায়তায় সোনারপুর স্টেশন সংলগ্ন বাস-অটো স্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হল এক প্রতিবাদ সভা। সভাটি ছিল দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসা ছড়ানোর বিরুদ্ধে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে এবং CAA-NRC-NPR-NRIC বাতিলের দাবীতে। সভায় বক্তব্য রাখেন শাখা ও জেলার একাধিক APDR-নেতৃত্ব এবং অধিকার-কর্মীরা। সভামঞ্চ থেকে ধ্বনিত হয় সমস্ত রাজবন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিও। দেশজুড়ে ঘটে চলা রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দ্বারা বিচার-বহির্ভূত সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার বক্তারা সোচ্চার হন।

লোকসভা নির্বাচনের আবহে গতানুগতিক ‘এই চিহ্নে ভোট দিন’ শ্লোগানের ভিন্নতর বার্তা নিয়ে অনুষ্ঠিত APDR এর এই সভা মানুষের কাছে কিছু ব্যতিক্রমী অথচ জরুরী বিষয় হাজির করায় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর) সোনারপুর শাখার প্রচার কর্মসূচী

২৯ মে ২০২৪, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর) সোনারপুর শাখা সোনারপুর ও রাজপুর অঞ্চলে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর) সোনারপুর শাখা প্রাক-লোকসভা নির্বাচন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সারাদিন ব্যাপী একটি চলমান প্রচার কর্মসূচীর আয়োজন করে।

চলমান প্রচারকেন্দ্র থেকে বক্তব্য রাখেন এ পি ডি আর সোনারপুর শাখার সহ-সভাপতি সরোজ বোস, সদস্য দেবাশিস ভট্টাচার্য ও সম্পাদক জগদীশ সরদার।

চলমান প্রচার কেন্দ্র থেকে APDR সোনারপুর শাখা জনগণের কাছে আহ্বান জানায়,

১। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত সকল দালাল, ঘুষের কারবারী শাসক দলের নেতা-মন্ত্রী ও সরকারী আমলাদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার দাবীতে সোচ্চার হন। সমস্ত যোগ্যদের অবিলম্বে নিয়োগ এবং অযোগ্যদের বরখাস্তের দাবি জানান।

২। CAA, UAPA, AFSPA–সহ সমস্ত মৌলিক অধিকার খর্বকারী এবং মানবাধিকার ধ্বংসকারী কালা আইন সমূহ বাতিলের দাবীতে আমাদের আন্দোলনে সামিল হোন। ধর্ম ও জাতপাতের নামে কোনও জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতন করার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুন।

৩। সারা দেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের নিঃশর্তে মুক্তির দাবীতে আওয়াজ তুলুন।

৪। অধিকাররক্ষা কর্মী, সমাজকর্মী, সাংবাদিক ও সংগ্রামী সাধারণ মানুষের উপর পুলিশি ও রাষ্ট্রীয় জুলুমের বিরুদ্ধে এবং দেশের জল-জমি-জঙ্গল-প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

চলমান প্রচার ঘিরে মানুষের এলাকার যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যতে মানুষের কাছে আরও প্রচারের বার্তা নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার রাখে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর) সোনারপুর শাখা।

হুগলী জেলা কমিটি ও শাখাগুলির কার্যাবলীর প্রতিবেদন

১৮/০৪/২০২৪ নর্থ শ্যামনগর জুট মিলের গেটবাহার শ্রমিকদের উপর ১০৭ ধারায় মামলার বিষয়ে সমিতির সদস্য আইনজীবীর সাথে আলোচনা

২০/০৪/২০২৪ নর্থ শ্যামনগর জুট মিলের গেটবাহার শ্রমিকদের ১০৭ ধারায় মামলার নোটিস দেবার অজুহাতে গভীর রাতে তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে পুলিসের ভয় দেখানোর চেষ্টার বিরুদ্ধে ভদ্রেশ্বর থানার আই সির সাথে দেখা করে প্রতিবাদ জ্ঞাপন

২২/০৪/২০২৪ নর্থ শ্যামনগর জুট মিলের গেটবাহার শ্রমিকদের সমস্যার বিষয়ে ঐ মিলের এ আই সি সি টি ইউ নেতৃত্বের সাথে আলোচনা

২২/০৪/২০২৪ নর্থ শ্যামনগর জুট মিলের গেটবাহার শ্রমিকদের সমস্যার বিষয়ে এ আই টি ইউ সি নেতৃত্বের সাথে আলোচনা

২২/০৪/২০২৪ নর্থ শ্যামনগর জুট মিলের গেটবাহার শ্রমিকদের উপর ১০৭ ধারায় মামলার বিষয়ে সমিতির সদস্য আইনজীবীর সাথে আলোচনা

০৩/০৫/২০২৪ হাজার হাজার শিক্ষক শিক্ষাকর্মীর বিনা দোষে চাকরী বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে/দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের শাস্তি না দিয়ে নিরপরাধ ও চুনোপুঁটিদের কঠোর শাস্তির বিরুদ্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে শ্রীরামপুর শাখার পথসভা

০৭/০৫/২০২৪ চন্দননগরের মহকুমা শাসকের আদেশে হোমে থাকা মহিলাকে তাঁর পরিবারের কাছে প্রত্যার্পণের বিষয়ে চন্দননগরের মহকুমা শাসকের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা।

১৪/০৫/২০২৪ চন্দননগর শাখার দ্বারা সিএএ ও এনআরসি বিরোধী প্রচারপত্র বিতরণ

১৪/০৫/২০২৪ কোন্নগরের একটি শিশুর যৌন নির্যাতনের অভিযোগের তদন্তের অগ্রগতির বিষয়ে কানাইপুর ফাঁড়িতে তথ্য সংগ্রহ

২৮/০৫/২০২৪ জাঙ্গীপাড়ার শেল্টার হোমে থাকা সুরু বিন্দ্রানিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর সংক্রান্ত প্রশাসনিক জটিলতার বিষয়ে চন্দননগরের মহকুমা শাসকের সাথে সাক্ষাৎ

৩১/০৫/২০২৪ জাঙ্গীপাড়ার শেল্টার হোমে থাকা সুরু বিন্দ্রানিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর সংক্রান্ত প্রশাসনিক জটিলতার বিষয়ে হুগলী জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিকের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা

০৮/০৬/২০২৪ ছত্তিশগড়ে আদিবাসী ও প্রতিবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যার প্রতিবাদে, এন আর সি ও সি এ এ-র বিরুদ্ধে, এবং নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চুঁচুড়ায় জেলা কমিটির পথসভা

২২/০৬/২০২৪ চুঁচুড়া শাখার উদ্যোগে পথসভা অনুষ্ঠিত হয় চুঁচুড়া ঘড়ি মোড়ে। বিষয় ছিল—১) রাষ্ট্র কর্তৃক ছত্তিশগড়ে আদিবাসী এবং রাজনৈতিক কর্মী হত্যার বিরুদ্ধে। ২) লেখক-চিন্তাবিদ অরুন্ধতী রায়ের বিরুদ্ধে ইউ এ পি এ চার্জ লাগানোর প্রতিবাদ। ৩) আর পি এ-এর রেল হকারকে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সভায় বক্তব্য রাখেন— সাধন বসু, কল্যাণবাবু, চৈতালী দাস, শঙ্কর দাস, সোমনাথ বসু, অরিজিৎ গাঙ্গুলী, কমল দত্ত, প্রমুখ। সঞ্চালক ছিলেন অমলকৃষ্ণ রায়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির কর্মসূচী

১৪/০২/২৪, আমাদের জেলার একটি প্রতিনিধি দল সন্দেশখালি যায়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনরায় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা মিলিতভাবে যায়। সেই রিপোর্ট বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে। উল্লেখ্য আমাদের এই তথ্যানুসন্ধানে আমাদের দুই জেলার প্রতিনিধিদের সাথে হুগলি জেলা কমিটির জয়ন্ত মুন্সী ছিলেন।

বারুইপুরের মলয় চন্ডীপুরে পাওয়ার গ্ৰীড তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। ঐ এলাকায় আমাদের জেলার গড়িয়া, সোনারপুর এবং মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা শাখার একাধিক সদস্য একাধিকবার যান। এলাকাবাসী অনিচ্ছুক জমিদাতাদের সাথে চার বার বসা হয়। তাঁরা বেশ ভয়ের মধ্যে আছেন। অনেকেই সামনাসামনি আসতে চান না। আবার অনেকেই পরোক্ষ রাজনৈতিক মদতে ঐক্য ভাঙার চেষ্টা করছেন। মাঝখানে মাথা গলিয়েছে সংঘ পরিবার। পাওয়ার গ্ৰীড হবেই। শুধু তাঁরা ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাবেন না।

১৬/০৩/২৪, ডায়মন্ড হারবারে অসাংবিধানিক CAA বাতিলের দাবিতে পথসভা হয়।

৩১/০৩/২৪, মৈপীঠ-এ মৎস্যজীবিদের সাথে আলোচনায় বসেন জেলার তিন প্রতিনিধি। আলোচনার বিষয় ছিল, 'আমরা কেন এপিডিআর করব'।

০৪/০৪/২৪, জেলা কমিটির উদ্যোগে, সোনারপুর শাখার সহযোগিতায় দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসা ছড়ানোর বিরুদ্ধে এবং সি এ এ বাতিলের দাবিতে সোনারপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন অটো স্ট্যান্ডে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

২২ এপ্রিল, ২০২৪, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে জয়নগর মৈপীঠ শাখার সহযোগিতায় সমুদ্রসাথী কার্ডে পাওয়ার জন্য মৎস্যজীবিদের নিয়ে জামতলা বিডিও অফিসে মিছিল সহযোগে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

১ মে, ২০২৪, মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা শাখার ১৫ তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

৭ মে, ২০২৪, মেটিয়াব্রুজ মহেশতলার রবীন্দ্রনগর থানায় পাম্প চুরির অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করে। থানা হেফাজতে প্রচন্ড মারধোর করার ফলে চিন্টু শেখ নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। অন্য যুবকটি গুরুতর আহত অবস্থায় নাদিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এই বিষয়ে ৮ মে, ২০২৪ মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা শাখার সদস্যরা তথ্যানুসন্ধানে গেলে শাসকদলের মদতপুষ্ট স্থানীয় দুষ্কৃতিরা এপিডিআর সদস্যদের উপর হামলা করে। বাইক ভেঙে দেয়। ৯ মে, ২০২৪, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় ডেপুটেশন দেওয়া হয় জেলা কমিটির উদ্যোগে। ১০ মে, ২০২৪, মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা শাখা নাদিয়াল থানায় ডেপুটেশন দেয়।

১২ মে, ২০২৪, রবীন্দ্রনগর থানা এলাকায় পথসভা অনুষ্ঠিত হয় মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা শাখার উদ্যোগে।

১৭ মে, ২০২৪ ডায়মন্ড হারবার জেলে অচিন্ত্য হালদার নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। জেলে তথ্যানুসন্ধানে গেলে জেলর কোনও অবস্থাতেই দেখা করতে ও কথা বলতে চায় না।

২২ মে, ২০২৪ ডায়মন্ড হারবার শাখা মৃত অচিন্ত্য হালদার বাড়ি কুলপী থানার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর গ্রামে যায়। গিয়ে জানতে পারে ঐ গ্রামে, ঐ পরিবারের কেউ বাস করে না। খোঁজখবর করে মৃত অচিন্ত্য হালদারের এক বোনের ফোন নম্বর পাওয়া যায়। ফোনে কথা বলে জানতে পারি দীর্ঘদিন বোনের সাথে দাদার যোগাযোগ ছিল না। পুলিশ কেন ধরেছে তাও জানে না। পুলিশের বয়ান মোতাবেক প্রচন্ড গ্যাস হওয়ার ফলে স্ট্রোক হয়ে মারা গেছে।

৩০মে, ২০২৪ বারুইপুরে এক মাতাজির আশ্রমে একটি তের বছরের বালককে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়।

৬ জুন, ২০২৪ সোনারপুর শাখা তথ্যানুসন্ধানে যায়। ঐ তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে।

১৫ জুন, ২০২৪ ছত্রিশগড়ে আদিবাসীদের লাগাতার রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, হত্যা, বোমাবর্ষণের প্রতিবাদে ও ভোট পরবর্তী রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রতিবাদে গড়িয়া শাখার উদ্যোগে জেলা কমিটির সহায়তায় ৪৫ বি বাসস্ট্যান্ডে পথসভা হয়।

বন্দিমুক্তিসহ রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক যে কোনও হিংসা, নিপীড়ন, অত্যাচার, হত্যার প্রতিবাদে ডায়মন্ড হারবার শাখা লাগাতার পোস্টার লাগানোর কর্মসূচী করে চলেছে।

কৃষ্ণনগর শাখা

ছত্তিশগড়ে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে

১) রাজনৈতিক বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে, অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের উপর রাষ্ট্রীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে ১২ই জুন সদর হাসপাতাল মোড়ে প্রতিবাদ সভা হয়।

২) রাজনৈতিক কর্মী-লেখক কিশলয় ব্রহ্মের স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

৩) সমাজকর্মী-লেখক-চিন্তাবিদ অরুন্ধতী রায় ও শওকত হোসেনের বিরুদ্ধে ইউ এ পি এ প্রত্যাহারের দাবিতে

৪) সম্প্রতি ছত্তিশগড় গণহত্যার বিরোধিতা করার জন্য পি ইউ সি এল কর্মী সহ দেশের সমস্ত গণ আন্দোলন কর্মী, রাজনৈতিক কর্মীর উপর ইউ এ পি এ ধারা প্রয়োগের বিরোধিতায়, ইউ এ পি এ, ন্যায় দন্ড সংহিতা বাতিলের দাবিতে এবং সি এ এ বাতিলের দাবিতে

২১ শে জুন, ২০২৪ যৌথ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হয়।

শিকারপুর শাখা

৭ই জুন, ২০২৪ দুপুর দু'টো থেকে শিকারপুর বি ডি ও অফিসের সামনে মৎস্যজীবী ও এলাকার মানুষের দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত একটি গণ অবস্থান আয়োজিত হয়। নাগরিক অধিকার পাইয়ে দেওয়ার সোনার পাথর বাটি নয় বরং তা দীর্ঘ ও নিরন্তর লড়াইয়ের প্রাপ্তি হিসেবেই নাগরিকরা উপভোগ করতে পারেন—গণ অবস্থানে বিভিন্ন বক্তাদের বক্তব্যে এই আওয়াজই ওঠে। বক্তব্য রাখেন, সোমনাথ বসু, আব্দুল গণি খান (ডোমকল), রাহুল চক্রবর্তী, সৌরভ রায়, অনুপ মন্ডল, আব্দুল গনি সেখ (শিকারপুর) ও মৌতুলি নাগ সরকার।

৮ই জুন, ২০২৪, বি আর সি পুর এলাকায় একশো নং গেট খোলার দাবিতে আজ এলাকার কৃষকদের সাথে, এপিডি আর শিকারপুর শাখার পক্ষ থেকে ৮৬ নং ব্যাটেলিয়নের কমান্ডার-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, গত চৌদ্দ বছর ধরে এই গেট বন্ধ আছে। মধ্যবর্তী সময়ে কিছুদিনের জন্য খুললে ও আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ।কৃষকদের অভিযোগ, এই গেট বন্ধ থাকার কারণে কৃষক ও গ্রামবাসীদের দুর্গম পথ দিয়ে অনেকটা পথ ঘুরে কৃষিক্ষেতে যেতে হয়। ৮৬ নং ব্যাটেলিয়নের এন্ট্রি করার খাতা-কলমও গ্রামবাসীদের কিনে দিতে বাধ্য করে এই

ব্যাটেলিয়নের সেন্ট্রিরা। এই বিষয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিক্ষোভ থাকলেও যেহেতু ঐ শর্তেই গেট খুলতে রাজি থাকে তাই ৯৭, ৯৮ নং গেট ব্যবহার করার জন্য গ্রামবাসীরা কিনে দিতে বাধ্য হন।

এপিডিআর শিকারপুর শাখার সাথে কুড়ি জন গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। এপিডিআর, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত থাকেন, মৌতুলি নাগ সরকার ও রাহুল চক্রবর্তী। কম্যান্ডা-এর সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি গ্রামবাসী, কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী গেট খোলার অঙ্গীকার করেন। ঠিক পরেরদিন, অর্থাৎ ৯ ই জুন একশো নং গেট খুলে দেয় বি এস এফ।

সীমান্ত এলাকায় বি এস এফ মর্জিমাফিক বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে ও গ্রামবাসীদের স্বাধীন জীবন যাপনের অধিকারের পক্ষে শিকারপুর শাখা এই কাজকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছে। নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার করার সংগ্রাম আগামী -দিনেও চলবে।

তথ্যানুসন্ধান

সপ্তম শ্রেণির ছাত্র পবিত্র সর্দার (বয়স ১৪) কে চোর সন্দেহে একটি আশ্রমে পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনা নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির তথ্যানুসন্ধান

তারিখ : ০৬/০৬/২০২৪

স্থান : উত্তরভাগ বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

ঘটনা : একটি আশ্রমে চোর সন্দেহে ১৪ বছরের বালককে পিটিয়ে হত্যা।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির দুজন সদস্য জগদীশ সরদার ও দেবাশিস ভট্টাচার্য গত ০৬ জুন ২০২৪ বারুইপুরের উত্তরভাগে একটি আশ্রমে ১৪ বছরের বালক ৭ম শ্রেণির ছাত্র পবিত্র সর্দারকে পিটিয়ে মারার ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করতে যায়।

প্রথমেই যাওয়া হয় নিহত কিশোর পবিত্র সরদারের মামার বাড়ি এলাকায়। সেখানে তার মামা বাদল সর্দারের সাথে কথা বলে জানা যায়, পবিত্র তার মা মালতী সর্দারের সাথে ঢাকুরিয়ায় থাকতো। উত্তরভাগে তার মামাবাড়ি হওয়ায় সে মাঝেমাঝেই এখানে আসত। তার আর-এক মামা কমল সর্দার ওই এলাকার ওই আশ্রমে থাকত এবং আশ্রমের একটি মহিলার সাথে বিবাহসুত্রে আবদ্ধ ছিল, সেই সুত্রে পবিত্র সেই আশ্রমেও যেত। আশ্রমের প্রধান ছিলেন একজন মাতাজি (সংবাদপত্র অনুযায়ী যার নাম শম্পা ঘোষ অথবা অঙ্কিতা চক্রবর্তী), যিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী। প্রশাসনের বহু 'উঁচু' স্তরে নাকি তাঁর যোগাযোগ আছে।

চারমাস আগে আশ্রমে একটি চুরির ঘটনা ঘটে, তখন আশ্রম-প্রধান 'মাতাজি' কমল এবং পবিত্রকে চুরির অপবাদ দেয়। কমলের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ করে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে কমল আবার আশ্রমে ফিরে এসেছিল কী-না, বাদল সর্দার স্পষ্ট বলেননি। সাম্প্রতিক ঘটনাটি ঘটে ২৬ অথবা ২৭ মে, ২০২৪ (তারিখটি বাদলের মনে নেই, তবে ভোটের ২দিন আগে বলে তিনি জানান)। তাঁর বয়ান অনুযায়ী ঐদিন কিশোর পবিত্রকে বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী বা বাউন্সার দিয়ে তার ঢাকুরিয়ার বাসস্থান থেকে আশ্রমে বলপূর্বক তুলে আনেন মাতাজি। আশ্রমের গেটের ভিতরে নিরাপত্তারক্ষীদের ঘরে পবিত্রকে বেঁধে তার উপর প্রহার ও শারীরিক নির্যাতন শুরু হয়। সেই সময় আশ্রমের গেট বন্ধ ছিল। খবর পেয়ে বাদল সর্দার ও পবিত্রের অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এবং স্থানীয় লোকজন আশ্রমের গেটে জড়ো হয়, কিন্তু গেটে নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের তাড়িয়ে দেয়। বাদলসহ সকলে বাড়ি ফিরে যায়।

বাদলবাবুর বয়ান অনুযায়ী, তারপর সেদিন রাতে তাঁরা কেউ পবিত্রর খোঁজ নেন নি। পরদিন ভোর ৬টার সময় বাদলবাবুর ছেলের মোবাইলে সামাজিক মাধ্যমে একটি কিশোরের মৃতদেহের ছবি আসে। মৃতদেহটি নাকি ক্যানিং-এর কাটাখাল থেকে বারুইপুর পুলিশ উদ্ধার করে। তারপর থেকে দফায় দফায় আশ্রমের সামনে এলাকার লোকজনের বিক্ষোভ শুরু হয়। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত আশ্রমের গেট বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে দেহ এসে পৌঁছলে জনরোষ বেড়ে যায়। এই সময় বেশ কয়েকজন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। একজন সংবাদ প্রতিনিধির ক্যামেরা কেড়ে নেয় আশ্রমের নিরাপত্তারক্ষীরা। এরপর আশ্রমের ভিতরে ঢুকে বিক্ষোভ চলে, মাতাজি ও তাঁর দলবলকে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। বারুইপুর ও ক্যানিং থেকে পুলিশ ও র্যাফ এসে প্রথমে গ্রামবাসীদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এতে বাদল সর্দার আহত হন। আমাদের কাছে যখন বয়ান দিচ্ছিলেন তখনও তাঁর শরীরে ব্যাথা ও আঘাতের চিহ্ন ছিল। স্পষ্টতই, পুলিশ আসলে

অপরাধী মাতাজিকে বাঁচাতে এসেছিল। বিক্ষোভের চাপে পড়ে পুলিশ মাতাজিসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কিন্তু পবিত্রর মা ও মামা'রা যখন খুনের অভিযোগ জানাতে যায়, প্রথমে বারুইপুর থানার পুলিশ অভিযোগ নিতে চায়নি। পুলিশ পবিত্রের মৃতদেহ-সহ বাদল সর্দার ও তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে খিদিরপুর মর্গে যায়। সেখানে পোষ্ট মর্টেম হওয়ার পর মৃতদেহ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তারপর পবিত্রকে দাহ করা হয়।

বাদল সর্দারের মতে, আশ্রমে মাঝে মাঝেই অপরিচিত লোক আসত এবং বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ চলত। সেটা জেনে ফেলাতেই মাতাজি বালক পবিত্রকে তুলে এনে প্রহার করে মেরে ফেলেন। - এই ছিল পবিত্রের বড়মামা বাদল সর্দারের বয়ান। আর-এক মামা কমল সর্দার যিনি আশ্রমের সাথে যুক্ত, তাঁর হদিস বাদল সর্দার জানেন না বলে জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, মাতাজি ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে এফ আই আরের কপি এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পবিত্র সর্দারের মা মালতী সর্দারের কাছে আছে।

এরপর তথ্যানুসন্ধানকারী দল কথা বলে ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য শ্রী অলোক সর্দারের সঙ্গে। তিনি জানান, পবিত্র সর্দারকে যখন আশ্রমের মাতাজি এবং অন্যন্য বেঁধে দৈহিক নির্যাতন চালাচ্ছিল, তখন তিনি আশ্রমের প্রবেশদ্বারের সামনে এসে মাতাজির কাছে জানতে চান যে কেন কিশোরটির উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। মাতাজি বলেন সে চুরি করেছে। অলোকবাবু বলেন, আইন হাতে তুলে নেওয়া অন্যায়। তিনি অপরাধীকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে বলেন। কিন্তু মাতাজি তাঁর কথা শোনেন নি।

এরপর তথ্যানুসন্ধানকারী দল আশ্রমের ভিতরে ঢোকে। সেখানে সিকিউরিটি রুম, যেখানে একটি পিলারে বেঁধে পবিত্রকে মারা হয়, সেই রুমে এখন বারুইপুর থানার কয়েকজন পুলিশ থাকছে। আশ্রমের ভিতর দুটি মন্দির, ক্যান্টিন ও বেশ কয়েকটি কটেজ আছে। আছে বহু দেবদেবীর মূর্তি। মোট তিনটি পোষ্য কুকুর এখনও ভিতরে আছে, একটি মারা গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। আশ্রমের ভিতর মাতাজি যে বাড়িতে থাকতেন, সেটি তালাবন্ধ। ভিতরে দুটি বিদেশি প্রজাতির কুকুর ছাড়া আছে। কিছুটা আন্দাজ করা যায় যে, আশ্রমের সুরক্ষার জন্য এবং বাইরের লোকের কাছ থেকে কিছু গোপন করার জন্যই এমন হিংস্র পোষ্যগুলিকে রাখা হয়েছিল।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে তথ্যানুসন্ধানকারী দল যায় বারুইপুর থানায়। সেখানে কথা বলা হয় আই সি সৌম্যজিত রায়ের সাথে। বারুইপুর থানার আই সি কে কিশোর পবিত্রের গণপ্রহারে মৃত্যু সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি যা জানান, সেই বিবরণের সাথে পবিত্রর মামা বা মামাবাড়ি পাড়ার লোকের দেওয়া বয়ানের বিস্তর অমিল পাওয়া যায়। আই সি জানান, ১৪ বছরের পবিত্র সর্দার ছিল এক নৈতিক ভাবে উচ্ছন্নে যাওয়া কিশোর, আই সি-র ভাষায় Spoilt Child। এর কারণ, তার মা ও বাবার মধ্যে সম্পর্কে ভাঙন এবং বিচ্ছিন্ন থাকা। পবিত্র মায়ের কাছেই থাকত এবং সে নিয়মিত নেশা করত এবং সেইজন্য সে চুরিও করত। গত ২৭/০৫/২০২৪ ঘটনার দিন সে চুরি করার উদ্দেশ্যেই সে আশ্রমে ঢুকেছিল। তখন আশ্রমের রক্ষীরা ও মাতাজি তাকে ধরে মারধোর করে। তার মামা আশ্রমের কর্মী কমল সর্দারও পবিত্রকে সেদিন মেরেছিল (গত ১লা জুন আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনেও এমনটাই লেখা হয়েছিল)। মারধোরে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে মাতাজি একটি গাড়ি করে কিশোর পবিত্রকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠান। সেখানে পবিত্রের মৃত্যু হয়। আই সি জানান, এরপর মাতাজি সহ আশ্রমের সকলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং প্রথমে তাদের বিরুদ্ধে আইপিসি ৩০৪ এবং তারপর ৩০২ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে, আশ্রমে যে কোনো অসামাজিক কাজ চলত, তার কোনও প্রমাণ নাকি পুলিশ পায়নি।

পবিত্রের হত্যার ঘটনার ১৫ দিন আগেও না-কী সে আশ্রমে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল এবং মাতাজি তখন তার মামা কমলকেও দোষী সাব্যস্ত করে পুলিশে দেন (এর আগে পবিত্রের মামা বাদল সর্দার তথ্যানুসন্ধানকারী দলকে জানিয়েছিলেন যে সেই ঘটনাটি ৪ মাস আগের)। বারুইপুর থানার আই সি জানান, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আসেনি, তবে প্রাথমিক ভাবে চিকিৎসক তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে জানিয়েছেন, প্রচণ্ড মারধরের আঘাতেই ১৪ বছরের পবিত্রের মৃত্যু হয়েছিল।

সুতরাং, এই হত্যার ঘটনা সম্পর্কে মৃত কিশোর পবিত্র সর্দারের মামা ও পাড়ার লোকজনের বিবরণ এবং পুলিশের বিবরণে বেশ কিছু তথ্য পরস্পর বিরোধী। তবে, কিশোর পবিত্রকে তুলেই আনা হোক অথবা সে নিজে আশ্রমে প্রবেশ করুক, তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা দণ্ডনীয় অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন। সে চোর হলেও তাকে হত্যা করার অধিকার কারও নেই। তাই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির দাবি—

১। ১৪ বছরের কিশোর সপ্তম শ্রেণির ছাত্র পবিত্র সর্দারের খুনে

অপরাধী ওই আশ্রমের মাতাজি ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের বিচার করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। প্রশাসনে প্রভাব খাটিয়ে অপরাধীরা কোনোভাবেই জামিন দিয়ে যাতে মুক্তি না-পায়, সে বিষয়ে পুলিশ-প্রশাসনকে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

২। এই হত্যাকাণ্ডের দিন ঠিক কী-কী ঘটেছিল, তা সঠিক পুলিশি তদন্ত করে উন্মোচন করতে হবে।

৩। পবিত্র সর্দারের হত্যামঞ্চ ওই আশ্রমের আইনি বৈধতা এবং সেখানে কী-কী কার্যকলাপ চলত, সে বিষয়ে তদন্ত করে সত্য সামনে আনতে হবে।

৪। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন জায়গায় গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন আশ্রম ও অন্যন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে সব তথ্য প্রশাসনকে সংগ্রহ করতে হব।

৫। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় গণপ্রহারে হত্যার ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। গণপ্রহারে হত্যা বন্ধ করতে পুলিশ ও প্রশাসনকে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি

হোমে নয় জেলেই শিশু! জলপাইগুড়ি জেলে এপিডিআর এর তথ্যানুসন্ধান

১১মে ২০২৪, নির্ভরযোগ্য সূত্র মারফত খবর পেয়ে আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির একটি তথ্যানুসন্ধানী দল জলপাইগুড়ি জেলে পৌঁছাই। অভিযোগ ছিল, সেখানে বেশ কিছু শিশুকে রোহিঙ্গা সন্দেহে বেআইনিভাবে আটক করে রাখা হয়েছে। যাদের মধ্যে অনেকের বয়স ছয় পেরিয়ে যাবার পরেও তাদের কারা আইন ও শিশুসুরক্ষা আইন মোতাবেক হোমে পাঠানো হয়নি। তাদের মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুরুষ ওয়ার্ডে অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। জেলসুপার শ্রীযুক্ত দোরজি ভুটিয়ার সঙ্গে আমরা কথা বলি, এবং তাঁর কাছ থেকেও বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হই।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সর্বমোট ৩৯ টি নিরপরাধ শিশু জলপাইগুড়ি জেলে রয়েছে। যার মধ্যে ১১ বছর বয়সী থেকে দেড় মাসের শিশু পর্যন্ত আছে। এদের খাওয়া-দাওয়া, চিকিৎসা, শিক্ষার অধিকার সব কিছুই ভয়ঙ্কর ভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। জেল হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে কোনও চিকিৎসক নেই। এপিডিআর কর্মীদের প্রশ্নের উত্তরে জেলের ওয়েলফেয়ার অফিসার জানালেন, শিশুরা অসুস্থ হলে তাঁরা না-কী বিশেষ ব্যবস্থা করে জলপাইগুড়ি স্টেট হাসপাতালে পাঠান! আর শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে কোনও তথ্যই পাওয়া গেল না। সবাই নিরুত্তর। এদের মুক্তির বিষয়টিও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ফাঁসে আটকে আছে । মাঝখান থেকে ছয় পেরোনো বাচ্চারা মায়ের কাছ-ছাড়া হয়ে অন্য কয়েদিদের সঙ্গে থাকতে বাধ্য হচ্ছে, যেখানকার পরিবেশ তার শিশুমনের সুকোমল বৃত্তিকে তছনছ করে তাকে আগামী দিনের অপরাধী তৈরি করার সূতিকাগৃহ হিসেবে কাজ করছে বলে আমাদের আশঙ্কা।

তথ্যানুসন্ধানী দল: আলতাফ আহমেদ, রাহুল চক্রবর্ত্তী, মৌতুলি নাগ সরকার, শর্মিষ্ঠা দে

রামকৃষ্ণপুর, রাধাকান্তপুর, জগন্নাথপুর গ্রামের কৃষকদের দীর্ঘদিনের স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন, ভোট বয়কটের ডাক-পুলিসী সন্ত্রাস এবং মালদার জেলাশাসকের জনবিরোধী ও বিভ্রান্তিকর বিবৃতির প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির তরফ থেকে প্রকৃত তথ্য ও বাস্তব অবস্থার একটি প্রতিবেদন

গত ৭মে, ২০২৪, মালদা জেলাতে লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ছিল। ঐদিন আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম যে হবিবপুর ব্লকের একটি বুথের মানুষজন সেতু ও রাস্তার দাবীতে ভোট বয়কট করছেন। কিন্তু তার বিস্তৃত বিবরণ পাচ্ছিলাম না।কিন্তু পরের দিনই শুনতে পাই হবিবপুর ব্লকের তিনটি গ্রাম জগন্নাথপুর, রামকৃষ্ণপুর ও রাধাকান্তপুরের সমস্ত ভোটার-মানুষ যখন ভোট বয়কটের আহ্বান জানিয়ে ওই পোলিং বুথের সামনে শান্তিপূর্ণ অনশন ও অবস্থান করছিলেন। বিকেলবেলা জেলা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ নির্দেশে কয়েকজন বহিরাগত দিয়ে ওই বুথে ভোট দেওয়ানো হয়। গ্রামবাসীরা প্রশাসনের এই অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেন। তারা দাবি করেন ক'জন ভোট দিয়েছেন দেখাতে হবে। প্রশাসন তা দেখাতে রাজী হয়নি। এরপরে সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হতেই বিদ্যুৎ চলে যায় সেই সুযোগে পুলিশ ও র‍্যাফ নামিয়ে

উপস্থিত মহিলা পুরুষদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ নামিয়ে আনে প্রশাসন। অনেকেই আহত হয়ছেন ও আটজন পুরুষ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করা হয় । এর পরে আমরা আরও জানতে পারি পুলিস প্রতিদিন ওই গ্রামে রাতে ঢুকে এক সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে।

এই পরিস্থিতিতে আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির মালদা শাখা সিদ্ধান্ত নিই ওই গ্রামে গিয়ে তথ্য অনুসন্ধান করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে ১৮ মে ২০২৪ ওই গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও আগের রাত অবধি বিভিন্ন মহল থেকে আমাদের যাওয়া আটকানোর অনেক চেষ্টা করা হয়, তবে আমরা সিদ্ধান্তে দৃঢ় ছিলাম। তদনুযায়ী এপিডিআর মালদা শাখার সভাপতি নবেন্দু চ্যাটারজি সহ , সম্পাদক হাসনাথ সেখ , সহ , সম্পাদক কেয়া বাগচী , অন্যতম নেতৃত্ব অরিন্দম বিশ্বাস , শরদিন্দু চক্রবর্তী এই পাঁচজনের একটি তথ্যানুসন্ধানের একটি টিম ১৮মে, সকালে ঘটনাস্থলে যান । সকালে আমরা জগন্নাথপুর গ্রামে পৌঁছেই আমরা বুঝতে পারি গ্রামের লোকেরা কতটা ভীত এবং আতংকিত। আমাদের গাড়ি দেখে প্রথমে তারা ভাবে আবার পুলিস এসেছে। কারণ, ঐ ঘটনার পর থেকেই নিয়মিত রাতের বেলা গ্রামে পুলিস আসছে। আর পুলিস আসলেই পুরুষেরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যান আবার পুলিস চলে গেলে গ্রামে ফিরে আসেন। কখোনও সেটা সারারাত ধরে চলে। তারপর তাদের কাছে আমরা আমাদের পরিচয় দেই এবং ইতিমধ্যে সুমিত, যাদব, অনন্ত ‘র মতন আমাদের ফোন-পরিচিত গ্রামের আন্দোলনের নেতারা ধীরে ধীরে জমা হয়। এর পরে গ্রামের মহিলা পুরুষেরা জমা হতে থাকে। এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমরা গ্রামের মহিলাদের গোছানো দৃঢ় লড়াকু বক্তব্য শুনে চমৎকৃত হই।

এই গ্রামগুলোর ভৌগলিক চেহারাটা উল্লেখ করা দরকার।এই তিনটি গ্রাম মূল ভূখণ্ড থেকে কার্য্যত বিচ্ছিন্ন। জগন্নাথপুরের দিক থেকে গাজোল ব্লকের রাণিগঞ্জে যেতে হলে টাঙ্গন নদী পেরোতে হয়। আমরা এইদিক থেকেই নদীর শুকনো খাত দিয়ে গাড়ি নিয়ে ঢুকেছিলাম। আবার আর-এক দিকে হবিবপুর ব্লকের বারো মাইলে যেতে হলে আর-একটি খাড়ি পেরোতে হয়; অন্য একদিকে রয়েছে বিস্তীর্ণ উর্বর চাষের জমি যা' বর্ষাকালে পুরো জলের তলায় চলে যায়। মালদার মূল ভূখণ্ডের থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্রায় তিনহাজার মানুষের বাস এই তিনটি গ্রামে। সুতরাং এই বিবরণ থেকে পরিষ্কার যে এদের কতটা অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করতে হয়! এ যেন দেশের মধ্যে অন্য আর-এক দেশ। যদিও এই মালদা শহর থেকে গ্রামগুলির ভৌগলিক দূরত্ব মাত্র তেইশ কিলোমিটার হলেও ডিজিটাল যুগে মনের দূরত্ব হাজার মাইল।

ওখানকার মানুষের মুখ থেকে যা শুনলাম

মূলত পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষেরা এই গ্রামগুলির পত্তন করেছিলেন। ধীরে ধীরে বসতি বাড়তে থাকে। এই মানুষজনের জীবিকা মূলত কৃষি ও মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল। গত শতাব্দীর ৮১সালে আদিনা থেকে হবিবপুরের চাকুলি (পার্বতীপুর) গ্রাম অবধি প্রায় চৌত্রিশ কিলোমিটার একটি রাস্তা যা' ঐ তিনটি গ্রামের মধ্য দিয়ে যাবে তা' অনুমোদিত হয়। কিন্তু গত তেতাল্লিশ বছরেও ঐ অনুমোদিত চৌত্রিশ কিলোমিটারের মধ্যে আট কিলোমিটার যা ঐ তিনটি গ্রামকে মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত করবে তা'-কিন্তু আর হয়নি।গ্রামবাসীরা তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে দেখালেন যে রাস্তা পাকা হয়নি অথচ রাস্তার পাশে বড়বড় করে লেখা রাজ্য পূর্ত দফতরের রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সাইনবোর্ড টাঙ্গানো আছে।স্বাভাবিকভাবে গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, তার মানে কি খাতায় কলমে রাস্তা হয়ে গেছে! অথচ বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্বই নেই ? গ্রামবাসীরা বিশেষ করে মহিলারা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন যে, বর্ষাকালে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম নৌকা। এলাকায় হাইস্কুল নেই, কলেজ নেই, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। ফলে বর্ষাকালে ভরা নদীতে নৌকা করে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে মায়েদের মন চায় না। এর আগে নদীপথে বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে এখানে। এমন-কী, স্কুলের মাষ্টাররাও বর্ষার চারমাস স্কুলে আসতে বারণ করে। আর বেশী বর্ষাতে যেটুকু পাকা রাস্তা আছে তাও জলের তলায় চলে যায়। কাছাকাছি স্বাস্থ কেন্দ্রে, হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে না-যেতে পেরে গর্ভপাত বা গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু সাধারণ ঘটনা এখানে। তাছাড়া গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধে না-থাকায় অতিরিক্ত বহন খরচ হিসেবে তাদের ফসলের মূল্যতে কুইন্টাল পিছু একশো টাকা করে কম পান। এমনিতেই ফসলের ন্যায্য মূল্য পাওয়া যায় না তারপরে এই অবস্থা। এই অবস্থাতে এখানকার মহিলারা ‘মাতৃ গণ উদ্যোগ’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। গত প্রায় আঠারো মাস ধরে এই রাস্তা ও দুটি সেতুর ন্যায্য দাবিতে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে এই আন্দোলনের তীব্রতা এই সংগঠন বাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এই ‘ভোট বয়কটের’ ডাক।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তারা এই ‘ভোট বয়কটের’ ডাক দিয়েছিলেন। এই লোকসভা নির্বাচনেও তাদের ন্যায্য সুস্থ নাগরিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা ও সেতুর দাবির প্রতি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই শান্তিপূর্ণ ‘ভোট বয়কটের’ রাস্তা তারা বেছে নিয়েছিলেন।

৭ মে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের দিন ঠিক কী ঘটেছিল

৭মে তিন গ্রামের মহিলাদের আন্দোলনের সংগঠন ‘মাতৃ গণ উদ্যোগ’ এর মহিলারা ঐদিন সকাল থেকেই না-খেয়ে অনশনে থেকে রাধাকান্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পোলিং বুথের সামনে অবস্থান করছিলন। তাদের সাথে গ্রামের আর অন্য সবাইও জড়ো হয়েছিল। ওই বুথে মোট ১৩৫৬জন ভোটার রয়েছে। বিকেল পাঁচটা অবধি প্রশাসন শত চেষ্টা করেও ঐ তিন গ্রামের একজন ভোটারকে দিয়ে ভোট দেওয়াতে পারেনি। বিকেল পাঁচটার সময় গ্রামবাসীরা হঠাৎ দেখেন বাইরে থেকে তিনজনকে দিয়ে ভোট দেওয়ানো হচ্ছে। গ্রামবাসীরা তীব্র প্রতিবাদ করে। যে ধরণের ভোটই হোক-না-কেন, এই প্রত্যন্ত বুথে তাদের দিয়ে কেন ভোট দেওয়ানো হচ্ছে সেই প্রশ্ন তোলেন। তাদের বক্তব্য ভোট দেওয়া, বা না-দেওয়া তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তারা কোনও অশান্তি চাননি। যে প্রশাসনিক নিস্ক্রিয়তা তাদের প্রতিদিনের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে তা' সুরাহার জন্যই এই আন্দোলন। মুক্তি , বাসন্তী প্রমুখ গ্রামের মহিলারা সবাই বলেন যে, ওই দিন বিডিও, এসডিও, পুলিস সবাই চক্রান্ত করে প্রশাসনিকভাবে এটাই দেখাতে চেয়েছিল যে এখানে ভোট বয়কট হয়নি। ফলে তারা ইভিএমে ক'টা ভোট পড়েছে সেটি দেখতে চায় কিন্তু প্রশাসন তা দেখাতে অস্বীকার করে। তারা তখন বলে ক'টা ভোট পড়েছে জানিয়েদিলে তারপর তারা রাস্তা ছাড়বে। এই কথা চলার মধ্যেই সন্ধ্যার সময় বিদ্যুৎ চলে যায়। তারপর ঐ অন্ধকারের মধ্যেই সাতটার দিকে হঠাৎ পুলিস বাহিনী তাদের ওপর নির্মম আক্রমণ চালায়। কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়। সেই আক্রমণের শিকার হয় নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় উপস্থিত সবাই এমন-কী ঘরে ঘরে ঢুকে মহিলাদের ওপরেও পুলিশের আক্রমণ চলে। অন্তত ২০-২৫জন মহিলা আহত হন । কাঁদানে গ্যাসের শেলের আঘাতে শরীর পুড়ে যায় কয়েকজনের। এমন-কী অন্ধকারের মধ্যে বুঝতে না-পেরে পুলিসদের নিজেদের লাঠির বাড়িখেয়ে কয়েকজন আহত হয়। এই ভয়ংকর আক্রমণের মুখে গ্রামবাসীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে প্রশাসন ইভিএম নিয়ে যায় শুধু নয়; সাধারণ আটজন গ্রামবাসীকে আটক করে। বিভিন্ন মিথ্যে মামলায় তাদেরকে জড়িয়ে দেয়। তারা এখনও পুলিস হাজতে।

উল্লেখ্য যে, যেদিন আদালতে মামলা ওঠার কথা সেদিন গ্রামবাসীদের উকিলের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অভিযুক্তদের কোর্টে তোলা হয়। মবলিঞ্চিং এর মতন মিথ্যে অভিযোগের ঝুলি সাজিয়ে পুলিস গ্রামের সাধারণ ছেলেদের ১৪দিনের পুলিস হাজতে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। তারপর থেকে গ্রামের লোকেরা একটা রাতও পুলিসের ভয়ে ও অত্যাচারে আশঙ্কায় শান্তিতে থাকতে পারছেন না। এটিকে পুলিসি সন্ত্রাস ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে!

১৯ মে, ‘রূপান্তরের পথে’ পত্রিকায় জেলাশাসকের বিভ্রান্তিকর ও অসত্য বিবৃতি প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য

আমাদের সংগঠনের তরফে যেদিন ঐ তিন গ্রামে তথ্য-অনুসন্ধান দল যায় তার পরদিনই স্থানীয় ‘রূপান্তরের পথে’ পত্রিকায় জেলাশাসকের একটি বিবৃতি আমাদের নজরে আসে। প্রশাসনের এই ন্যাক্কারজনক অপদার্থতাকে আড়াল করবার জন্যই এই বিবৃতি বলে আমরা মনে করি। প্রথমেই উনি বলছেন, ‘সেদিন সবটাই ছিল একদল গ্রামবাসীর পরিকল্পনা মাফিক’। কোনটা পরিকল্পনা মাফিক ছিল বলে তিনি মনে করছেন? ‘ভোট বয়কট’ তো নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে ‘ভোট বয়কট’-কে ব্যবহার করা হয়ে আসছে এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু ‘ ভোট বয়কট’ কে বানচাল করবার জন্য ঐ বুথে ভোট বয়কট হয়নি-বিষয়টিকে এমনভাবে দেখানোর জন্য বাইরে থেকে দু'জন ভোটকর্মীকে নিয়ে এসে ইডি ভোট দেওয়ানোর মধ্যে দিয়ে প্ররোচনা সৃষ্টির পরিকল্পনা কার ছিল? এই পরিকল্পনা তো গ্রামবাসী করতে পারেনা। প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল যেন-তেন প্রকারেণ গ্রামবাসীদের উত্তেজিত করা, প্ররোচিত করা।

সুতরাং আমরা মনে করি সেদিনের ঘটনার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ জেলা প্রশাসনের ছিল গ্রামবাসীদের নয়। এর পরের বক্তব্যে উনি জেলা শাসক হিসেবে চরম অসংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। বলেছেন, ‘যে ব্রীজের দাবি করা হচ্ছে, তা' বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ, জেলা প্রশাসনের পক্ষে তৈরী করা সম্ভব নয়।’ এই বক্তব্য থেকে পরিকল্পনা কাদের ছিল তা-কী আর অস্পষ্ট রইল? ঐ তিনটি গ্রামের আন্দোলন জেলা প্রশাসনের কাছে গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে। তাই সেটাকে ধ্বংস করতে হবে। পুলিস , কোর্ট, কেস , জেল এটাই তো প্রশাসনের ব্যর্থতা

আড়ালের অস্ত্র। যে দেশ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কথা বলে, নাগরিক অধিকারের কথা বলে, সেখানে কয়েক হাজার মানুষের সুস্থ, স্বাস্থ্যকর জীবনের দাবিকে জেলাশাসক ঔপনিবেশিক কায়দায় খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে অর্থের অজুহাতে নাকচ করে দিচ্ছেন।

জেলা শাসক ভুলে যাচ্ছেন আন্দোলনকারীরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক ওনাদের প্রজা নন। অর্থের অজুহাত দেখানোর কোনও অধিকার ওনাদের নেই। জেলা প্রশাসন না-পারলে রাজ্য প্রশাসন করবে, না-হলে কেন্দ্র টাকা দেবে। ওনার কাজ হচ্ছে সঠিক জায়গায় দাবিগুলি ও তার ন্যায্যতা পৌঁছে দেওয়া। উনি, ওনার সেই কর্তব্যটাই অস্বীকার করছেন। এটি একটি চরম ঔদ্ধত্য এবং অসংবেদনশীলতার প্রকাশ। তারপরে উনি আবার গ্রামবাসীদের উপরই মিথ্যা দায় চাপিয়ে বলেছেন, তারা নাকি ‘ ব্যালট ইউনিট ছিনতাই করে নিয়ে যান। রাস্তা কেটে দেন।’ পুলিশের করা এফ আই আর-এ ব্যালট ইউনিট ছিনতাই এর কোনও উল্লেখ নেই। অর্থাৎ এরকম কোনও ঘটনাই ঘটেনি। তাহলে গ্রামবাসীদের সম্পর্কে তার এই অভিযোগের ভিত্তি কি ?

পুলিশের বক্তব্য, বিকেল অবধি এলাকা সম্পূর্ণ শান্ত ছিল; তাহলে রাস্তা কখন কাটা হল ? রাস্তা এত সহজে কাটা যায় না। আমরা গিয়েও রাস্তা কাটার কোন প্রমাণ খুঁজে পাইনি। তাই এটি পরিষ্কার জেলা শাসক এ-ব্যাপারে সঠিক কথা বলছেন না। ওই দিন কোনও রাস্তা কাটা হয়নি। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য। জেলা শাসক তথা জেলা প্রশাসন যে ভাবে হোক দায়টা গ্রামবাসীদের উপর চাপিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করে নিজেদের অপরাধকে আড়াল করতে ও তাঁদের প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা কে অস্বীকার করতে চাইছেন।

সবশেষে আমরা বলতে চাই, এই দেশের প্রতিটি সাধারণ নাগরিকের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকা ও নাগরিক পরিষেবা পাওয়ার অধিকার তাদের সাংবিধানিক অধিকার। সে কোন একজন মানুষ হোক কিংবা একই গোষ্ঠীভুক্ত অনেক মানুষই হোক-না-কেন! তাদের সুষ্ঠ নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করবার অধিকার জেলা প্রশাসন বা রাষ্ট্রের নেই। সে কারণে এই দু’টি সেতু ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই রাস্তার দাবি, ওই তিনটি গ্রামের মানুষদের অতি ন্যায্য দাবি। আমাদের সংগঠন এপিডিআর দাবি করে, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে এই তিনটি গ্রাম জগন্নাথপুর, রামকৃষ্ণপুর ও রাধাকান্তপুর-এর বাসিন্দাদের সেতু ও রাস্তার ন্যায্য দাবী পুরণের বন্দোবস্ত করার জন্য দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হোক। গ্রামবাসীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে নিঃশর্ত মুক্তির ব্যবস্থা করা হোক।

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে এ পি ডি আর তথ্যানুসন্ধানী দলের রিপোর্ট

১০ মে, ২০২৪ এপিডিআর আলিপুরদুয়ার শাখার সদস্যদের সঙ্গে আমরা পাঁচজন (আলতাফ আহমেদ, রাহুল চক্রবর্তী, মৌতুলি নাগ সরকার, হাসনাথ শেখ ও শর্মিষ্ঠা রায়) গেলাম জয়ন্তী পাহাড়ে। ওখানে গিয়ে জানা গেল, জয়ন্তী ও সংলগ্ন পাহাড় ও জঙ্গলে প্রায় ৩৮ টা গ্রামকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলছে। বনদপ্তরের বক্তব্য, তারা এই বনে বাঘ ছাড়বে। তাই সব মানুষকে পুনর্বাসন প্যাকেজ নিয়ে উঠে যেতে হবে। পুনর্বাসন প্যাকেজে প্রতি ভোটারের পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকা ও ৮ ডেসিম্যাল জমি দেওয়া হবে। এই প্যাকেজ নেবার জন্য নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ওখানকার অধিবাসীদের ওপর। জয়ন্তীর নাব্যতা এখানে খুব কম। রিভারবেড সমতলের সঙ্গে সমান হয়ে গেছে। ফলে সারাবছর জল না থাকলেও বর্ষা এলেই বন্যা হয়। এই বন্যা দূর করার কোনও উদ্যোগ বনদপ্তরের নেই। গ্রামসভার মধ্যে বেআইনি ভাবে হস্তক্ষেপ করে তারা প্যাকেজ নিতে অনিচ্ছুক সম্পাদককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে নিজেদের পছন্দের সম্পাদক নিয়োগ করে এক বিরাট সংখ্যক আদিবাসীদের প্যাকেজ ধরিয়েছে।

ইতিমধ্যেই ভুটিয়া বস্তি ও গাঙ্গুটিয়া বস্তিকে পুনর্বাসন দিয়েছে বনদপ্তর। এবার শুরু করেছে জয়ন্তীকে। আমরা ওখানে প্যাকেজ নিতে অনিচ্ছুকদের সঙ্গে দীর্ঘ মিটিং করলাম। জগদীশ ওঁরাও, শুভদীপ বসুরা এত চাপের মুখেও ভেঙে পড়েন নি, লড়াই করতে প্রস্তুত। রায়মাটাং এও আমরা এই বিষয়ে মিটিং করেছি। সব জায়গাতেই দেখা গেছে পর্যটন শিল্পকে গলা টিপে মারছে সরকার। একরকম জবরদস্তি করে প্যাকেজ নিতে বাধ্য করছে।

যারা বিবিধ চাপের মুখেও প্যাকেজ নিতে রাজি হননি, তাঁদের অভিযোগগুলি এখানে সংক্ষেপে দিলাম।

১. জঙ্গলকে বাঘের কোর এরিয়া বানানোর অজুহাতে গোটা বক্সা অঞ্চল মানুষশূন্য করা হচ্ছে। যদিও এখানকার লোকের বক্তব্য অনুযায়ী কোনওদিনই বক্সাতে বাঘ দেখা যায়নি। রীতিমতো নকল বাঘের পায়ের ছাপ তৈরি করে এলাকায় জঙ্গলে বসিয়ে বাঘের ভয় দেখানো হচ্ছে।

২. যাদের ১৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাদের সেখানে জলের ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, এমন-কী কোনও জীবিকা অর্জনের সুযোগটুকুও নেই। ফলে পুনর্বাসনের নামে সম্পূর্ণভাবে ভাঁওতা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সময়ে তৈরি ২০০৬ সালের টাইগার রিজার্ভ প্রজেক্ট ২০২১ সালে বিজেপি সরকার আরও কঠোরভাবে Relocation এর নামে প্রয়োগ করছে।

৩. গাছ লাগানোর জন্য বরাদ্দকৃত CAMPA ফান্ডের টাকা গ্রামের লোককে ভয় ও লোভ দেখিয়ে উৎখাত করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানেও কোনো সুনির্দিষ্ট চুক্তি নেই। কে টাকাটা দিচ্ছে, কাকে দিচ্ছে তা স্পষ্ট নয়।

৪. এই প্রজেক্ট কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সাহায্যে এলাকায় প্রয়োগ করছে। ফলে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, অতিরিক্ত জেলা শাসক ও জেলা শাসক সহ সকলেই এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িয়ে। যদিও এলাকার সাধারণ মানুষকে এলাকা ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রচার, ভয় দেখানো সবই করছে ফরেস্ট গার্ড। প্রশাসনিক কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে ফরেস্ট গার্ড, যা আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বেআইনি একটি কাজ।

৫. এলাকার মানুষের কাছে শোনা যাচ্ছে বক্সা পাহাড়ের মধ্যে না-কী ম্যাঙ্গানিজ ও আকরিক লৌহ পাওয়া গিয়েছে! তাই কর্পোরেটের হাতে এলাকার পাহাড় জঙ্গল তুলে দেওয়ার জন্য জনমানবশূন্য করার চেষ্টা চলছে বলে আশঙ্কা। আবার অনেকের অনুমান, ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে দিয়ে চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোডস প্রজেক্ট এর জন্য রাস্তা তৈরি হচ্ছে; তার জন্যও বক্সা পাহাড় মানবশূন্য করার দরকার। কারণ এই রাস্তা ভুটান বর্ডারের পাশ দিয়ে যাবে।

৬. এখনও পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, বিরোধিতা করলেই ফরেস্ট গার্ড কোনও, না-কোনও কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে পুরো এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে।

৭. বর্ষা শুরু হওয়ার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই জঙ্গলে সাফারি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এলাকার গাইডরা বেকার হয়ে গিয়েছে। বক্সা পাহাড়ের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান মহাকাল মন্দির। যেখানে অনেকেই ট্রেকিং করে দেখতে যায়। সেই মন্দিরে যাওয়া টুরিস্টদের জন্য পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

৮. ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট এখানে কোনও মান্যতাই পাচ্ছে না। ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট অনুযায়ী জঙ্গলের গ্রামবাসীদের জমির পাট্টা দেওয়ার কথা। অথচ, এলাকার জঙ্গলবাসীদের বহুদিনের দাবি সত্ত্বেও পাট্টা দেওয়া হয়নি। তাছাড়াও আইন অনুযায়ী আদিবাসীদের জায়গা কেনাবেচা করা যায় না। কিন্তু এখানে ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে আদিবাসীদের জঙ্গলের জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

৯. গ্রামবাসীদের ন্যূনতম চাষবাস হল সুপারি গাছ ও নানা রকম সবজি। যেটুকু লাভ হয় সেটুকও রক্ষা করার চেষ্টা এখানকার ফরেস্ট গার্ড বা প্রশাসন কোনওদিনই করেনি। চারিদিক দিয়ে বর্ষার সময় জল ঢোকে সুপারি গাছগুলো নষ্ট হয়ে যায়। গাছগুলিকে রক্ষা করার জন্য কোনও উন্নয়নের পরিকল্পনা এতদিন হয়নি। সব উন্নয়নের কাজই ফেলে রাখা হয়েছে। নদীর ওপর কোনও ব্রীজ না-থাকার কারণে বা একটি ব্রীজ ভেঙে যাওয়ার কারণে বর্ষার সময় গ্রামগুলি মূল শহর-এলাকা অর্থাৎ আলিপুরদুয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

জয়ন্তীর মিটিং থেকে ফিরে আমরা এলাম আলিপুরদুয়ারের শ্রীনাথপুর চা বাগানে। সেখানে তিনটি গ্রামের মানুষ উচ্ছেদের আতঙ্ক নিয়ে বাস করছেন। চা বাগান সংলগ্ন এক হাজার বিঘারও বেশি জমিতে কয়েক পুরুষ ধরে ওরা সবজি চাষ করেন। এখন চা বাগানের মালিক ও ম্যানেজার তাদের জমিতে ঢুকতে দিচ্ছেন না। গরিব, শিক্ষা বঞ্চিত মানুষেরা এই আক্রমণের মুখে অসহায় বোধ করছেন। তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক হয়েছে ২৪ জুন তিনটি গ্রামের লোক এপিডিআর আলিপুরদুয়ার শাখার নেতৃত্বে জেলাশাসকের অফিসে ডেপুটেশন দেবে।

তুফানগঞ্জ জেলাঃ কোচবিহার

১৫ মে, ২০২৪, আমরা এলাম কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বালাভূত গ্রামে। প্রায় ১৪০০০ ভোটার এই অঞ্চলে। সদ্য মিটেছে লোকসভা ভোট। নেতানেত্রীর ভিড় শান্ত হয়ে গেছে। মানুষের জীবনে নেমে এসেছে নিত্যকার ‘নুন আনতে পান্তা ফুরানো’ লড়াই। এর সঙ্গে প্রতিদিনের সঙ্গী বিএসএফের অত্যাচার।

বি এস এফ-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ

ভারতের সীমার মধ্যেই জমি। চাষের বলদ গোরু নিয়ে নদীর পারে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যান কৃষকেরা। বিএসএফ চৌকি যেতে দেবে না। শর্ত হল বেগার শ্রম দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করতে হবে। যতই তারা অন ক্যামেরা প্রতিটি গোরুর চেহারার সবরকম বিষয় রেজিস্ট্রি করিয়ে যাক, পনেরো দিনের

স্পেশাল পারমিট নিতে হবে। কৃষকের ট্রাকটরের প্রিমিয়াম দিতে হবে। অথচ, মাত্র কুড়ি লিটারের বেশি তেল কেনার অনুমতি নেই। চেকিং এর জটিলতায় মাঠে ঢুকতে বেলা গড়িয়ে যায়। কৃষক চাষ না-করতে পারলে কী-ভাবে ঋণ শোধ করবেন? কৃষকের জমির বাঁশ তাকে না-জানিয়ে কেটে তার জমিতেই চৌকি বানিয়েছে বিএসএফ। নদীর ধারে। আশে-পাশের গোটা গ্রামের মেয়েরা এই নদীতে স্নান করে। সব বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

এদিন সকালে জঙ্গল কাটবে না এই দাবিতে কৃষকেরা অবরোধ করেছিলেন। এর মধ্যে এসে পৌঁছলাম। বালাভূতের বিএসএফ এর কম্যাড্যান্টের সঙ্গে বসে আলোচনা হল গ্রামবাসী ও আমাদের এপিডিআর এর সদস্যদের। অবশেষে তিনি সবটাই মেনে নিয়েছেন। সবটাই সমাধান হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয় লোকজনের মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করে বিএসএফ এর কাজকর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তারা যাতে জানাতে পারেন, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে।

এর পর বিকেলে তুফানগঞ্জের কদমতলা বাজারে এপিডিআর এর পথসভা অনুষ্ঠিত হল। গ্রামবাসীদের উৎসাহ ছিল দেখার মত।

ভদ্রেশ্বরে শ্যামনগর (নর্থ) জুট মিলে মালিক পক্ষের বেআইনি কাজ ও প্রতিবাদী শ্রমিকদের উপর মিল মালিক এবং প্রশাসনের যৌথ আক্রমণ

গত ১লা এপ্রিল, ২০২৪ চন্দননগরে ডেপুটি লেবার কমিশনারের অফিসে শ্যামনগর (নর্থ) জুট মিল নিয়েএকটি মিটিং চলাকালীন অফিসের বাইরে জড়ো হওয়া কিছু মানুষকে তৃণমূল গুন্ডারা মারধোর করে। নিগৃহীত মানুষেরা চন্দননগর থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে তাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে শেষ পর্যন্ত তাদের লিখিত অভিযোগ জমা নেওয়া হয়।

উক্ত ঘটনা জানার পরে এপিডিআর শ্যামনগর (নর্থ) জুট মিলের সমস্যার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধান করে। ঐ মিলের কিছু শ্রমিক এপিডিআর-এর কাছে তাঁদের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন।

এপিডিআর গেট বাহার (suspended) শ্রমিক, এআইটিইউসি, সিটু, এআইসিসিটিইউ নেতৃত্ব, ভদ্রেশ্বর থানার আইসির সাথে কথা বলে।

ঘটনাক্রম

১) ২০২৪ সালের মার্চ মাসের ৬ তারিখ তাঁত বিভাগের শ্রমিকদের জানানো হয় যে, কিছু শ্রমিককে দু'টি তাঁতের বদলে ৬টি চায়না মেশিন (এস-৪) চালাতে হবে এবং এর ফলে তাঁত বিভাগের অতিরিক্ত শ্রমিকদের ফ্যাক্টরি সাইড থেকে মিলসাইডে বদলি করা হল। শ্রমিকদের কোনও লিখিত নোটিস দেওয়া হয়নি।

২) তাঁত বিভাগের শ্রমিকরা এই অন্যায় আদেশ অমান্য করেন। তাঁদের বক্তব্য, ১) একজন শ্রমিকের পক্ষে ৬টি মেশিন চালানো অসম্ভব, ২) ফ্যাক্টরি সাইড থেকে মিলসাইডে বদলি আসলে ডিমোশন, বদলি করতে হলে ফ্যাক্টরি সাইডেই করতে হবে। শ্রমিকরা ওয়াক আউট করেন।

৩) ৮ মার্চ, '২৪ মিলে সাসপেনসন অফ ওয়ার্ক ঘোষণা হয়।

৪) ১০মার্চ, ২০২৪ থেকে মিল খোলার ও তাঁত শ্রমিকদের দাবিগুলি নিয়ে মিল গেটে অবস্থান শুরু হয়।

৫) শাসকদল ও পুলিশ কাজে নেমে পড়ে। ভদ্রেশ্বর পৌরসভার চেয়ারম্যান সালিশীর নামে শ্রমিকদের ভয় দেখান। পুলিস শ্রমিক মহল্লায় গিয়ে মানুষদের সন্ত্রস্ত করতে শুরু করে। পুলিস জোর করে অবস্থান তুলে নিতে বাধ্য করে।

৬) মালিকপক্ষ আন্দোলনরত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে ১০৭ সিআরপিসি ধারায় মামলা করে। এই মামলার নোটিস দেবার জন্য পুলিস মাঝরাতে শ্রমিকদের বাড়িতে যায়।

৭) মিল কর্তৃপক্ষ দু'দফায় ১৫জন করে মোট ৩০জন শ্রমিককে শো-কজ করে।

৮) ১লা এপ্রিল চন্দননগরে ডেপুটি লেবার কমিশনারের অফিসে শ্যামনগর (নর্থ) জুট মিল নিয়ে একটি ত্রি-পাক্ষিক মিটিং হয়। এই মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয় যে, ২য় দফায় শো-কজ করা হয়েছে এমন ১৫ জনকে কাজে যোগ দিতে দেওয়া হবে আর প্রথম দফায় যাঁদের শো-কজ করা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া সাপেক্ষে সম্ভবপরভাবে ১৫ দিনের মধ্যে কাজে যোগ দিতে দেওয়া হবে। ২রা এপ্রিল, ২০২৪ মিল চালু হয়।

৯) সিটু নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্তে সই করেননি। তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে, ১লা এপ্রিলের মিটিং-এ পুলিস উপস্থিত ছিল।

আমাদের পর্যবেক্ষণ জানুয়ারি মাসের জুটশিল্পের

ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী, রাজ্য প্রোডাক্টিভিটি কাউন্সিল জুট মিলের শ্রমিক-মেশিনের অনুপাত পরীক্ষা করে সুপারিশ করবে এবং সব পক্ষের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে এই বিষয়ে ৬ মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই সুপারিশ পাওয়া যায়নি। ফলে বিস্তারিত আলোচনাও হয়নি। অতএব, একজন শ্রমিককে দিয়ে ৬টা মেশিন চালানোর সিদ্ধান্ত বেআইনি।

শাসকদল ও পুলিস প্রশাসনের দ্বারা একটি শ্রম বিবাদকে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে দেখানোর চেষ্টা আসলে মিল মালিকের দালালি। বিশেষ করে ১০৭ সিআরপিসি ধারার মামলার নোটিস দিতে মাঝ রাতে শ্রমিকদের বাড়িতে যাওয়াটাও সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরী করার অপচেষ্টা।

এপিডিআর ভদ্রেশ্বর থানার আইসি'র সাথে দেখা করে পুলিশের এই কাজগুলির সমালোচনা করেছে এবং এপিডিআর তার সাধ্যমতো পুলিশের এই ভূমিকার বিষয় মানুষের কাছে নিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে। এপিডিআর এটাও লক্ষ্য করেছে যে ১লা এপ্রিল,'২৪ তৃণমূলী গুন্ডাদের দ্বারা প্রহৃত মানুষদের অভিযোগের বিষয়ে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

২০২৪, ১লা এপ্রিলের মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম দফায় যাঁদের শো-কজ করা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া সাপেক্ষে সম্ভবপরভাবে ১৫ দিনের মধ্যে কাজে যোগ দিতে দেওয়া হবে। ওই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে মালিক পক্ষের সব অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে ৪ ঠা মে,'২৪ রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। এই রিপোর্টে ইচ্ছাকৃত ভাঙচুরের যে অভিযোগ মালিক পক্ষের তরফে করা হয়েছিল, সে বিষয়ে তেমন কোনও প্রনিধানযোগ্য প্রমাণ (পক্ষে বা বিপক্ষে) রিপোর্টে হাজির করা হয়নি। অথচ রিপোর্টের উপসংহারে এই অভিযোগ সত্য বলেই দাবি করা হয়েছে। এই তদন্ত চলাকালীন গেট বাহার শ্রমিকদের সাসপেনসন ভাতা দেওয়া হয়নি, বলাই বাহুল্য তা' নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষও হয়নি। ডেপুটি লেবার কমিশনার, চন্দননগর এব্যাপারে কোনও ভূমিকা নেয়নি।

সিদ্ধান্ত মিল কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের মদতে শ্রমিকদের উপর বেআইনিভাবে অস্বাভাবিক কাজের বোঝা চাপাচ্ছে। প্রতিবাদ করলেই শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করে পুলিসি সন্ত্রাসের মুখে ফেলা হচ্ছে। ত্রি-পাক্ষিক মিটিং-এ পুলিসের উপস্থিতির অভিযোগ যদি সত্যি হয় তবে আমরা পুলিসি রাষ্ট্রের দিকে শনৈশনৈ এগিয়ে চলেছি। সিটু বাদে উপস্থিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি কেন প্রতিবাদ করলো না, সেটাও ভাববার কথা প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের পাশে থাকছেন না, শ্রমিকেরাও ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর আস্থা হারিয়েছেন।

তথ্যানুসন্ধানী দল: অগ্নীশ্বর চক্রবর্তী/ কমল দত্ত/ গৌতম মুন্সি/ জয়দেব দাস/ প্রদীপ ব্যানার্জি/ বাপী দাশগুপ্ত/ ভার্গব দাশগুপ্ত/ শুভময় ঘোষাল/ সঞ্জীব আচার্য্য।

তথ্যানুসন্ধান: সন্দেশখালি

৫ জানুয়ারী, ২০২৪, শাহাজাহানের বাড়ি, সন্দেশখালিতে ই ডি পৌছনোর পর সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক প্রেক্ষাপট আমাদের চোখের সামনে হাজির হলো। জোর করে জমি দখল, তোলাবাজি, লুটেরাদের রাজত্ব তৈরি করা, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, খুনের চেষ্টার মত অভিযোগ উঠে আসলো। একটি সমাজকে অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে, শাসক দলের নেতা ও তার সাগরেদরা। এমন পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, এ পি ডি আর, তথ্যানুসন্ধান করেছে, ২৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখে। বিলম্বের কারণ, সন্দেশখালি অঞ্চলকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছিল সরকারের পুলিশ বাহিনী। আমাদের সমিতির কর্মীরা অঞ্চল ভিত্তিক তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে এই তথ্যানুসধান করেছে। সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরার জন্য তিনটি দলের রিপোর্ট একটি নিবন্ধে ১ ২ ৩ স্তম্ভে দেওয়া হলো।

১

২৯ শে মার্চ ২০২৪, শুক্রবার সমিতির ১৯ জনের একটি প্রতিনিধি দল তিনভাগে ভাগ হয়ে সরবেরিয়া, বেড়মজুর ১, জেলিয়াখালি, ও সন্দেশখালি ২ নং ব্লকে যাই।

আমরা কলোনিপাড়া, পাত্রপাড়া, কর্ণখালি ও মাঝেরপাড়া এলাকার নানা অংশের মানুষের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ-খবর শুরু করি।

২০১১'র সেনসাস অনুযায়ী সন্দেশখালি ২নং ব্লকের ১৯টি গ্রামের, মোট জনসংখ্যা ১,৬০,৯৭৬। পুরুষের সংখ্যা ৮১,৯২১ (৫১), মহিলা ৭৯,০৫৫ (৪৯)। এস সি+এস টি জনসংখ্যা একত্রে ৭২,৩০০+৩৭,৬৯৫=১,০৯,৯৯৫। মোট জনসংখ্যার ৬৮.৩৩ শতাংশ এস সি-এস টি। ৬ বছরের নীচে শিশুদের সংখ্যা ২১,২৭১ জন। জনসংখ্যার নিরিখে মুসলিম জনসংখ্যা ২২.২৭ শতাংশ।

শাসকদলের আঞ্চলিক ক্ষমতাশালী অংশের নানা দুর্নীতি, অত্যাচার, বলপূর্বক জমি দখল, (জলকর নামে পরিচিত) জোর-জবরদস্তি করে চাষের জমিতে নোনাজল ঢুকিয়ে দিয়ে জমি দিতে বাধ্য করা সহ মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতন, কয়েকটি ক্ষেত্রে ধর্ষণ সহ নানা নিপীড়নের বিরুদ্ধে এলাকার মহিলাদের সংগঠিত প্রতিরোধের(এপি সেন্টার) কেন্দ্র হচ্ছে কলোনি পাড়া, পাত্রপাড়া, কর্নখালি ও মাঝের পাড়া। যতটা সম্ভব উক্ত এলাকাগুলির মানুষের সাথে কথা বলে বুঝতে পারি, আন্দোলন বর্তমানে ক্ষাণিকটা স্তিমিত হলেও শাসকদলের অবর্ণনীয় অত্যাচারের ভয়াবহ আতঙ্ক তাঁদের আজও তাড়া করে বেড়াচ্ছে। অনেকেই নাম প্রকাশ না-করার শর্তে সেই অভিজ্ঞতা আমাদের শুনিয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ, শিশু-নারী-মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিরা ফিরে যাবার পর তারা আবার নতুন আক্রমণের সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেন।

কলোনিপাড়া

প্রথমেই আমরা সন্দেশখালি কলোনি পাড়ার বিজেপি পার্থী রেখা পাত্রের শ্বশুর বাড়িতে যেতে গিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে পুলিশ চৌকি দেখতে পাই। যদিও তারা আমাদের লক্ষ্য করলেও তেমন বাধা দেবার চেষ্টা করেনি।

কলোনিপাড়ার জনৈক বাসিন্দা কুলিয়া সরদার আমাদের রেখা পাত্রের বাড়িটা দেখিয়ে দেন। তিনি জানান, তাঁর বাবা লক্ষ্মণ সরদার পারিবারিক সাড়ে তিন কাঠা জমি বিঘা প্রতি ৬-৭ হাজার টাকা চুক্তিতে শিবু হাজরাকে দিলেও লিজের টাকা নিয়মিত পান না। এবং কেউ-কেউ নিজের জমি দিতে বাধ্য হন। না-হলে জোর করে নোনা জল ঢুকিয়ে দেবার কথা বলেন।

এরপর আমরা লোকসভা ভোটে বিজেপি'র প্রার্থী, এলাকা মহিলা প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম মুখ, যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে আদালতে জবানবন্দি দেওয়া, রেখা পাত্রের বাড়িতে যাই। তাঁর শ্বশুর ধীরেনবাবু জানালেন, রেখা পাত্র বিজেপি প্রর্থী হবার পর তিনি স্বামী সন্দীপ পাত্রের সাথে বসিরহাট সদরেই থাকেন। মাঝে মাঝে বাড়িতে আসেন। তাই বাড়ির সামনে পুলিশ চৌকি বসানো হয়েছে। ধীরেনবাবু জানালেন, সিপিএমের সময়কালে শিবু, উত্তমরা এতটা অত্যাচারী ছিল না। আরও জানালেন, কাছাকাছি একটি সরকারি হেল্থ সেন্টার থাকলেও ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী না-থাকায় তাঁদের খুলনা নদী পেরিয়ে কয়েক কিলোমিটার দূরের খুলনা হাসপাতালে যেতে হয়। ঢিল ছোড়া দূরত্বে সন্দেশখালি থানা স্বত্বেও শিবু-উত্তমদের যে-কোনও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা কোনও প্রশাসনিক সাহায্য পান না। এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁরা রেখা পাত্রের জয় হোক; সেটা চান। তিনি আরও বলেন, অঞ্চলে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ভালো। চলমান আন্দোলনে কোনও রাজনৈতিক সম্পর্ক তাঁরা চাননি।

এরপর, আমরা কিছুটা দূরে এক-দেড়শো পরিবারের বাস, পাত্র পাড়ার কয়েকজনের সাথে কথা বলি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি পরিবারের সাথে দীর্ঘক্ষণ আামাদের কথা হয়। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে ঐ বাড়ির বড় ছেলে জানান, ভাগ্নেকে কোচিন থেকে আনতে গিয়ে তাঁর বোন থানা সংলগ্ন টোটো ষ্ট্যান্ডে শিবু হাজরার আশ্রিত দুষ্কৃতিদের দ্বারা যৌন হেনস্তার স্বীকার হন। এই খবর শুনে, তিনি বোনকে বাঁচাতে গেলে দুষ্কৃতিরা তাঁকে বেধরক মার-ধর করে।

চলমান আন্দোলনের ফলে শিবু হাজরা মেটিয়া থানায় ১১০ জনের সাথে তাঁর নামে ৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৪, ৩০৭ ধারায় মিথ্যা মামলা দায়ের করে। তিনদিন হেফাজতে থেকে তিনি জামিনে ছাড়া পান। আরও অভিযোগ করেন, তাঁদের দীর্ঘদিন কেনও ভোট দিতে দেওয়া হয় না। দু'বছর ধরে ১০০ দিনের কাজের টাকা শিবু, উত্তম'রা আটকে রেখেছে। বেশিরভাগ সময়ই জব কার্ডের টাকা ওরা তুলে নেয়। ৩২০০ টাকা জব কার্ডে এসেছিল ৫০০ টাকা দিয়ে বাকিটা ওরা নিয়ে নেয়। গন্ডগোলের পর অনেকের লক্ষ্মীর ভান্ডার ও জব কার্ডের টাকা এখনও ঢোকেনি।

কৃষি জমি মোটের উপর সমস্তটাই নোনা জল ঢুকিয়ে ভেড়ি বানিয়ে ফেলায়, এলাকায় কোনও কাজ আর পাওয়া যায় না। এলাকার অধিকাংশ পুরুষেরা তামিলনাড়ুতে চলে যান। বিধ্বংশী 'আয়লা' ও 'আম্ফান' ঝড়ের পর স্কুলছুট বাচ্চারাও বাইরে কাজে চলে যায়। সামান্য ধানের জমি ছিল, পাকা ধানটুকু কেটে নেবার সময় না-দিয়ে ওরা জোর করে নোনা জল ঢুকিয়ে দেয়।

আমাদের তথ্যানুসন্ধানী দলের দুই মহিলা সদস্যের সাথে একান্ত আলোচনায় ঐ বাড়ির গৃহবধূ ধর্ষণের ঘটনা সামনে আনেন।

এরপর আমরা ডাসা নদীর পার্শ্ববর্তী কর্ণখালি এলাকায় গিয়ে মানুষজনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি। জনৈক সঞ্জয় দাস (নাম পরিবর্তিত) জানালেন, তাঁরা পুর্বপুরুষের সাথে এই

গ্রামে প্রায় ১৪০ বছর বসবাস করছেন। অভাব গ্রামের মানুষের নিত্যসঙ্গী হলেও তাঁরা এখানে শান্তিতেই বসবাস করতেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর, গ্রামীণ জীবনের স্বাভাবিক শান্তিটুকুও নষ্ট হয়েছে। কাজের অভাবে এলাকা মোটামুটি পুরুষ শূন্য। জনসংখ্যার নিরিখে এলাকায় পুরুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে ও শুধু মহিলারাই এখানে পড়ে রয়েছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ডাসা নদীর ওপারে চাঁড়ালখালি দিয়ে অনুব্রত-শাজাহানদের নিরাপদ গরু পাচারের করিডর হিসাবে উল্লেখযোগ্য পথ। এখানকার জনজাতি মানুষদের অধিকাংশই 'কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব' ধর্মে বিশ্বাসী ও অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। একইসাথে তিনি দাবি করেন, ক্ষমতাসীন শাসকদলের আঞ্চলিক নেতাদের সীমাহীন দুর্নীতি, অত্যাচার, সীমাহীন বর্বরতার বিরুদ্ধে দেওয়াল পিঠ ঠেকে যাওয়া মহিলাদের প্রতিরোধ স্বতঃস্ফূর্ত। রাজনৈতিক দলগুলির নানা চেষ্টা থাকলেও আন্দোলনকারীরা কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক সচেতনভাবেই এড়িয়ে গিয়েছেন। এলাকায় আন্দোলনের উত্তাপ খানিকটা স্তিমিত হবার সুযোগে রাজনৈতিক দলগুলোর নানা বিন্যাস যেমন তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছে। তেমনি শাজাহান-শিবু-উত্তমদের অনুপস্থিতিতে দিলিপ মল্লিকের মতো শাসকদলের অন্য অংশগুলো রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার দখল নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ আবার নতুন ভয়, আতঙ্ক, অস্থিরতা ও আক্রমণের আশঙ্কা করছেন। এরপর আমরা মাঝখানে বিস্তীর্ণ ভেড়ি এলাকা ঘুরে কর্ণখালির দক্ষিণ অংশে চলে আসি। সেখানেও বহু মহিলা ও পুরুষ এগিয়ে এসে আমাদের সাথে কথা বলেন। তাঁরা একলপ্তে ৩৫০বিঘার বিস্তীর্ণ জলাভূমি ও ভেড়ি দেখিয়ে আমাদের জানান, এই সমস্ত বেআইনি সম্পত্তির অবৈধ মালিক শিবু হাজরা। আর সেই ভেড়ির মধ্যেই তাঁর সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য গড়ে তোলা অত্যাচারের কেন্দ্র বাগানবাড়ি। যেখানে রাত-বিরেত মহিলাদের ডেকে এনে নানা অত্যাচার চালাতো। আন্দোলন চলাকালীন ক্ষুব্ধ মহিলারা সেই ইমারত সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন।

কাছারিপাড়া

এরপর কাছারিপাড়া নিবাসি সুজয় কান্দার (নাম পরিবর্তিত) ২৬, জানালেন, তাঁদের তিন শরিক-এর পুরো ৭৫ বিঘা জমি কী-ভাবে শিবু হাজরা বলপূর্বক লিজ দিতে বাধ্য করে। যদিও লিজের পুরো টাকা শিবু দিত না এবং তিনি বাধা দেওয়ায় তাঁকে কী-ভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিগ্রহ করে। তাঁর একটা ইঞ্জিন ভ্যান কেড়ে নেয়। এলাকায় মানুষের আন্দোলনের পর, শিবু হাজরা গত ৮ই ফেব্রুয়ারী, '২৪ ন্যাজাট থানাতে অন্যান্য ৭৬ জনের সাথে তাঁর নামে ১৪৭/১৪৮/৩২৩/৩৩২/৩৫৩/১৮৬ ও ১৮৯ ধারায় মামলা করে।

জনৈক বাসন্তী মন্ডল জানিয়েছেন, আয়লার পর শিবু তাদের দু'বিঘা জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে দিয়ে জোর করে নিয়ে নেয়। তিনি চলমান ঐ আন্দোলনে শঙ্খ কাসর বাজিয়ে লোক জড়ো করতেন।

মাঝেরপাড়া

এরপর আমরা মাঝেরপাড়া এলাকায় শিবু হাজারর দশ বিঘার খামার ও পোল্ট্রি, (হাজরা অ্যাগ্রো ফুড ইন্ডিয়া) যা' এলাকার মানুষের ক্ষোভের ফলে ধ্বংস করা হয়,তা' দেখতে যাই।

এরপর আমরা ধামাখালি হয়ে ফিরে আসি।

তথ্যানুসন্ধানী দল বেলঘরিয়া-নিমতা শাখা: শঙ্কর দাস, মিহির কুমার সাহা, সন্দীপ দে, শর্মিলা দে, অর্চনা মিত্র (দেবী 'দি), মনসুর আলী

ইছাপুর-নোয়াপাড়া শাখা: বাপিদাস, মহআলাউদ্দিন এবং সরোজ মন্ডল

২

হালদারপাড়া, জেলিয়াখালী গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলে যে অভিযোগুলি উঠে আসে তা হল—

২০১১ সালের রাজ্যের রাজনৈতিক পালা বদলের সাথে সন্দেশখালির বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক বদল হতে শুরু করে। রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র চলে যায় পুরোপুরি স্থানীয় সমাজবিরোধীদের কাছে। ধীরে-ধীরে শেখ শাহজাহান, উত্তম সরদার, শিবু হাজরার মতো সমাজবিরোধীদের দ্রুত উত্থান শুরু হয়। তারাই এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। সেক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন ধরেই স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সমস্ত রকমের সহযোগিতা তারা পেতে শুরু করে। কার্যত ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই সমস্ত ধরণের নির্বাচন এখানে এক প্রহসনে পরিণত হয়। এলাকার মানুষ ভোট দেওয়ার কথা একপ্রকার ভুলেই যায়। গত ২০১৩ পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে আজ অবধি কোনও নির্বাচনে তারা ভোট দিতে পারে নি। এলাকার মানুষের

বক্তব্য বাম আমলে ও অল্প বিস্তর দুর্নীতি ছিল, কিন্তু বিরোধী দলের লোকেরা নিজের ভোট নিজে দিতে পারতো। কিন্তু এখন তৃণমুলের সাধারণ মানুষ নিজের ভোট আর নিজেই দিতে পারে না। এমনকি বিরোধী রাজনৈতিক দল বিজেপির এজেন্টকে বুথে বসতে দিত, শর্ত ছিল ৪০টা ছাপ্পা ভোট দেওয়াতে হবে। সেই শর্ত মানতে বাধ্য হতো।

২০১৩ সালের পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে, শিবু হাজরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চায়েত সমিতিতে এবং তাঁর স্ত্রী বর্ণা হাজরা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হয়। তারপর থেকেই শিবু হাজরা এবং তাঁর কিছু স্থানীয় সমাজবিরোধী সাকরেদঃ সাহেব সর্দার, কামাল শেখ, মোতালেব শেখ, আবু তালেব, জিয়ারুল মোল্লা, অসীম, রামপ্রসাদ ঘোষ, সাজ্জাদ শেখ, সুরজিৎ সর্দার, কৃষ্ণ হালদার, পিন্টু সর্দার নিজ নিজ অঞ্চলের রাজনৈতিক জমিদার হয়ে উঠতে শুরু করে। এদের নেতা ছিল শাহাজান, শিবু এবং উত্তম।

গ্রামের পুরুষ-মহিলাদের দিয়ে জোর করে MGNREGA-তে কাজ করিয়ে টাকা না-দেওয়া, শিবুর জলকরে কাজ করিয়ে টাকা না-দেওয়া, জোর করে অপরের জমি নিয়ে নেওয়া, যে-কোনও অছিলায় গ্রামের মানুষের থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করা, অকারণে গ্রামের পুরুষ-মহিলাদের মার-ধর করা এসবই ছিল বিগত ১২-১৩ বছরের প্রতিদিনের ঘটনা। গ্রামের মানুষ ভুলেই গেছে ভোট দেওয়া কাকে বলে। কেউ টাকা দিতে, কাজ করে টাকা চাইলে, জমি দিতে অস্বীকার করলে তাকে বিজেপি বলে তকমা লাগিয়ে মারধর করা হোত। এ-ব্যাপারে তারা প্রশাসনের দ্বারস্থ হলে থানা থেকে বলা হত শিবু হাজরার কাছ থেকে লিখিয়ে আনো। শুধু মারধর নয় মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়েও দেওয়া হতো। শিবুদের কথায় প্রশাসন চলত। ওই গ্রামের বিশ্বজিৎ সর্দারকে (৪৮) বিষমদের ব্যবসায়ী বলে, মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে সাত দিন লক আপে আটকে রাখে সন্দেশখালী থানা, এমন-কী কোর্টেও তোলেনি। পরে বসিরহাট কোর্ট থেকে তিনি জামিন পান।

প্রায়ই রাত ১২ 'টার পরে গ্রামের ছেলে, মেয়েদের স্থানীয় জেলিয়াখালি হাই স্কুলে ডেকে পাঠানো হতো, মিটিং-এর নাম করে। তারপর চলতো নির্মম-পাশবিক অত্যাচার। কোদালের বাট, ফাইবারের লাঠি, ইলেকট্রিক চাবুক দিয়ে ছেলে-মেয়ে সবাইকে মারা হতো। মাঝমাঝেই গ্রামের ছোট বাচ্চা, যারা রাস্তার উপর খেলা করে, তারাও এদের মারধরের শিকার হতো।

গ্রামের লক্ষ-লক্ষ টাকা মূল্যের দামী দামী গাছগুলিকে কেটে এরা বিক্রি করেছে। কোনও-কোনও বাড়ির দামী গাছ বিনা পয়সায় জোর করে কেটে নিয়ে গিয়ে নৌকা বানানো, ঘর বানানো, নিজেদের গেস্ট হাউস বানানো, আসবাব পত্র সহ বিভিন্ন কাজে শিবু হাজরা ব্যবহার করতো। এছাড়া রাস্তার ধারে পছন্দসই জায়গা জোর করে দখল করতো, সামান্য টাকা দিয়ে দলিল করতো, পরে আর কোন টাকাই দিত না। এলাকার লোকজন বাঁধা দিতে পারতো না, দিতে বাধ্য হত। কোনও মহিলার উপর তার নজর পড়লে, তাকে ভোগ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগতো। ভাঙ্গাতুষখালি বৈদ্যপাড়ার আনিসুর মোল্লা আশঙ্কা ও ভবিতব্যের কথা শোনালো; বললো যে, শেখ শাহজাহান আর দু'বছর বাইরে থাকলে গ্রামের কোনও লোকের বউ আর নিরাপদ থাকতো না।

হালদারপারার সৌরভ সর্দার নিজের বাড়িতে ছোট আকারে পোল্ট্রি ফার্ম করে মুরগি পালন করতো। শিবু হাজরা স্থানীয় সব বাজার ব্যবসায়ীদের বলে দিয়েছিল যে সৌরভ এর থেকে কেউ যেন মুরগি না কেনে, কারণ সবাইকে শিবু নিজের পোল্ট্রি ফার্ম এর মুরগি চড়া দামে কিনতে বাধ্য করতো।

বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই এলাকায় বিজেপি প্রথম ২৩ টি ভোট পায়। অথচ, ভোট চলাকালীন এই শাহজাহান, শিবু, উত্তমের লোকেরা বুথের ভিতরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতো কে কোথায় ব্যালট পেপারে ছাপ দেয়। তারপর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হতো। তারপর, শিবুদের সন্দেহ আরও বাড়তে থাকে গ্রামের লোকের প্রতি। আর সাথে-সাথে বেড়ে যায় শাহজাহান, শিবুদের অত্যাচারের মাত্রা। গ্রামের লোক থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে তাদের থানার পুলিশ বলতো আগে শিবুর থেকে লিখে নিয়ে আয়, তবে অভিযোগ নেব। এইভাবে গ্রামের লোক তাদের টাকা, জমি দিতে অস্বীকার করলেই শাহজাহান, শিবু থানায় মিথ্যা কেস করে এই মানুষদের জেলে পাঠিয়ে দিত। এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এলাকার এক অলিখিত নিয়ম।

শাহজাহান ধরা পরার পর, গত ৯ফেব্রুয়ারি '২৪ তারিখে, গ্রামের মানুষ বিশেষ করে মহিলারা একজোট হয়ে শিবুর পোল্ট্রি ফার্ম ভেঙে কিছুটা অংশে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এর মধ্যেই থানা থেকে সিভিক পুলিশ ও ট্রুপ নিয়ে শিবুর ওই গুণ্ডা বাহিনী এসে হাজির হয়। পুলিশের সামনে শিবুর গুন্ডাবাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তাদেরকে যথেষ্ট মারধর করে চলে যায়।

পরে, পুলিশ এসে গ্রামের মহিলাদের গরু পেটানোর মতো বাঁশ, লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করে। অনেক মহিলাকে মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেয়। তার মধ্যে পল্লবী হালদার নামে এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীও ছিল। গ্রামের মহিলারা ১৫ দিন দমদম সেন্ট্রাল জেলে বন্দি থাকে। পরে বিজেপির সহায়তায় তারা হাই কোর্ট থেকে জামিন পায়।

২৭ মার্চ, ২০২৪, পাখিরালয় গ্রামে বিজেপির বুথ কমিটি গঠনের মিটিং চলছিল। সেই সময় শিবুর গুণ্ডা আবু তালেব থানায় ফোন করে জানায় যে, তার বাড়ী ভাঙচুর করার মিটিং চলছে। থানা থেকে সাথে-সাথে সেই মিটিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাধারণ গ্রামের মানুষের এর ক্ষেত্রে এক নিয়ম; আর তৃণমুলের গুন্ডা বাহিনীর ক্ষেত্রে আর-এক নিয়ম!

ভাঙাতোষখালি

ভাঙাতোষখালি গ্রাম। মূলত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। এখানেও শিবুদের অত্যাচার অব্যাহত ছিল। রাস্তায় শিবুর প্রায় এক কিমি দীর্ঘ জলকর! কয়েক বিঘা জমির ওপর তৈরি বাগান বাড়ি! সবই পরিদর্শন করা হয় এবং ছবি তোলা হয়। ভাঙ্গাতুষখালি গ্রামের বৈদ্যপাড়া গ্রামের পুরুষ, মহিলাদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, এই গ্রামের মানুষের জমি বিনা পয়সায় দখল করে শাহজাহান, শিবু মাছের বিশাল বিশাল ভেরি তৈরি করেছে। একটা ভেরি ৭০০ বিঘা নামে খ্যাত। সেখানে যাওয়ার জন্য আলাদা ভাবে ইটের সুন্দর রাস্তা রয়েছে। শিবুর বিশ্রামাগার, সবই রয়েছে। অন্য এলাকার মানুষের মতো এই গ্রামের আনিসুর মোল্লারও প্রায় ৬ বিঘা জমি দখল করে নেয়। তারপর জমির টাকা চাইলে ২০১৮ সালে তাকে প্রচণ্ড মেরে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। আনিসুর এর হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ৫.৫ এ নেমে আসে। তারপর রুটি রুজির আশায় সে কলকাতায় খিদিরপুর এলাকায় এসে রাজ মিস্ত্রির কাজ শুরু করে। এখনও সে ওই কাজেই যুক্ত। এখানেও পুরুষ মহিলা সবাই বলে যে, তারা বিগত ১২-১৩ বছর কোনোদিন ভোট দিতে পারেনি। এই এলাকায় শিবুর গুণ্ডা জিয়ারুল মোল্লা অত্যাচার চালাতো।

আনিসুর আরও জানিয়েছেন, সন্দেশখালি এলাকয় কালো পয়সার রমরমা কারবার চলে এই শাজাহান, শিবু, উত্তমদের দৌলতে। বাড়ির মহিলাদের উপরেও অত্যাচার করতো শিবু ও তার গুণ্ডা বাহিনী। এলাকায় কোনো পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। শিবুরাই পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে দেয় নি। এই মুসলিম পাড়ায় ও বাচ্চারা কখনো-না-কখনো শিবুদের অত্যাচারের শিকার হয়েছে। স্থানীয় বড় ছেলে মেয়েরা অনেক দূরের শুকদোয়ানি হাই স্কুলে যায়। এখানে ঔঙ্গঞ্চ ও অনিয়মিত। আই সি ডি এস-এর খাবারও অকাতরে চুরি হয়; ফলে বাচ্চারা খাবার নিয়মিত পায় না। এলাকার একমাত্র প্রাইমারি স্কুলের বাড়ি ভেঙে গেছে, তাই ছোট ছোট বাচ্চাদের প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে অন্য একটা প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস করতে যেতে হয়।

গ্রামের মহিলাদের শেল্ফ হেল্প গ্রুপের টাকা, শিবু বাহিনী ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগসাজোশে প্যারালাল একাউন্ট খুলে এটিএম কার্ড বের করে সেই টাকার সমস্তটাই তুলে নেয়। সেলফ হেল্প গ্রুপের একাউন্টে কোন টাকা নেই। সব গ্রাম গুলোতেই আমফান, বুলবুল এর ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা বানানো হয়েছিল। কিন্তু সব কিছু শিবু, শাহজাহান এরা লুট করে নেয়। ফলে সাধারণ মানুষ সেই তিমিরেই রয়ে যায়। কারুর ক্ষমতা ছিল না নিজের প্রাপ্য বুঝে নেবার।

সব গ্রাম গুলিতেই পাকা বাড়ি চোখে পড়েনি। আবাস যোজনার সব টাকা লুট করেছে। সেটার বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়িয়ে ছিল কৌশিক ভট্টাচার্য নামের বিডিও। কিন্তু তাঁকে বিডিও আফিসের মধ্যেই শাহজাহান, শিবু'র দল-বল ব্যাপক মারধর করে। পরে ওনার ট্রান্সফার হয়ে যায় উপর মহলের নির্দেশে।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়

১) হাইকোর্টের নির্দেশে ঘোষণা করা হলো যে, গ্রামবাসীদের অভিযোগ নথিভুক্ত করার জন্য গ্রামে গ্রামে ক্যাম্প বসানো হবে। কিন্তু হালদারপাড়া সহ এই এলাকায় কোনও ক্যাম্প বসানো হয়নি। সিভিক পুলিশদেরকে দিয়ে অভিযোগগুলি নেওয়া হয়েছে। তা' কোথায় গেছে কেউ জানে না!

২) ৯ ফেব্রুয়ারি, '২৪ তারিখে, শিবুর পোল্ট্রিতে যে আগুন লাগানো হয়েছিল, গ্রামবাসীদের ধারণা এটা প্রধান সাহেবের দলবল আগুন লাগিয়েছিল। পরে গ্রামের মহিলারা সেটাতে যোগ দেয়।

৩) ৯ ফেব্রুয়ারি, '২৪ তারিখে, পুলিশের সামনে শিবুর গুন্ডাবাহিনী যখন হামলা চালায় তা'তে কয়েকজনের মাথা ফাটে পা ভেঙে যায়। পুলিশ তাদেরকে বড় কোনও হাসপাতালেতো নিয়ে যেতে দেয়নি, উপরন্তু থানার ওসি স্থানীয় গ্রামীণ ডাক্তারদেরকে নির্দেশ দেয় যে, ব্যান্ডেজ করে ছেড়ে দাও, কোনও ট্রিটমেন্ট যেন না-হয়; না করা হয়।

৪) মার্চ মাসে সন্দেশখালি ১ এবং ২ নম্বর ব্লকের সমস্ত

সরকারি ভাতা,বৃদ্ধ ভাতা, লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ সমস্ত ভাতা বন্ধ আছে। কোনও টাকা ঢোকেনি, কারো একাউন্টে।

৫) এলাকার মানুষের বক্তব্য, এলাকায় সাম্প্রদায়িকতার বীজ তৃণমূলই পুঁতে ছিল নানারকম ভাবে।

৬) এলাকায় পানীয় জলের সংকট প্রচন্ড, অনেক দূর, প্রায় ১ কিমি পথ ভেঙে বাড়ির মহিলাদের পানীয় জল আনতে হয়!

৭) সন্দেশখালি এক এবং দুই ব্লকে কোনও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। চিকিৎসার জন্য সেই ক্যানিং-এ যেতে হয়; না-হলে কলকাতা!

৮) দু'নম্বর ব্লকে জেলিয়াখালী এলাকায় কোনও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। উচ্চ মাধ্যমিকে পড়তে গেলে ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে নদী পেরিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের যেতে হয়!

৯) গ্রামের মানুষ এখনও আতঙ্কের মধ্যে আছে। দিনের বেলায় সমস্যা নেই। কিন্তু রাতে এখনও শিবু হাজরার গুণ্ডা বাহিনী এসে বাড়িতে-বাড়িতে হুমকি দিয়ে যায়!

১০) স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের লোকজন এখনও শাহজাহান, শিবুর হয়েই কাজ করছে। তারা কোনও নিরাপত্তা গ্রামের মানুষদের দিতে চাইছে না।

১১) গ্রামের ছেলেরা বাইরে কাজে যায়, কিন্তু সর্বদা ঘরে রেখে-যাওয়া পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য চিন্তায় থাকে; কখন তাদের কোনও ক্ষতি হয়ে যায়!

১২) গ্রামের কিছু পুরুষ মহিলাকে এখনও কোর্টে বা থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হয়; তাদের বিরুদ্ধে হওয়া মিথ্যা মামলাগুলোর জন্য।

১৩) নিজেদের পয়সায় নিয়মিত কোর্টে উকিলদের টাকা মেটাতে হয়; তাদের বিরুদ্ধে হওয়া ওই মিথ্যা মামলাগুলিকে লড়ার জন্য।

১৪) শিবু'র বা শাহজাহানের গুণ্ডা বাহিনীর অন্য সদস্যরা এখনও গ্রামে গ্রামে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়; কারণ, তারা জানে যে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন তাদের সাথেই আছে।

১৫) গ্রামের মানুষ এটা ভেবে ও আতঙ্কিত যে' শাহজাহান বা শিবুরা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে বের হয়ে এলে সাধারণ গ্রামবাসীর উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে যেতে পারে।

তথ্যানুসন্ধানী দল: জয়ন্ত মুন্সি, শাহানারা খাতুন, আলতাফ আহমেদ, কোয়েলী গাঙ্গুলী, অসীম পালিত, মোঃ মনসুর আলি

৩

সরবেড়িয়া বাজার ও সরবেড়িয়া হাই স্কুল থেকে ২ কিমি দূরে আকুঞ্জিপাড়ায় শাজাহান সেখের বাড়ি। আমাদের তথ্যানুসনধানী দল সরবেড়িয়াতে এবং সেখান থেকে ১২ কিমি দূরে পোলপাড়া, বেড়মজুর আদিবাসী গ্রামের কয়েকটি বাড়িতে গিয়ে কথা বলে।

সন্দেশখালি অঞ্চলের জমির চরিত্র বুঝতে গেলে অনেক বছর পিছিয়ে যেতে হবে। বেশীরভাগ জমি ছিল জমিদারের। তাদের শেষ বংশধর শ্রীনাথ দাস। তারা জমি জায়গার খোঁজ রাখতো না। এগুলি দেখাশোনা করত নায়েব বা ম্যানেজার। জমিদার-নায়েব-লাঠিয়ালদের পর্য্যায় পেরিয়ে তাদের উত্তরাধিকারী এইভাবে জমির দখলদারী চলে আসছে। জমিদারের শেষ নায়েব বা ম্যানেজার ছিলেন খগেন্দ্র নাথ ঘোষ। ঢাকুরিয়ার সেলিম পুরে থাকতেন। মাঝে-মাঝে এসে জমির জন্য চাষীদের থেকে টাকা নিয়ে গিয়েছেন। বেশীরভাগ চাষীই, ভাগচাষী ছিল। খগেন্দ্র নাথ ঘোষ মারা যাওয়ার পরে কেউ আসতো না। জমিদারের বংশধরেরা জমির খবর রাখতো না। সেই সুযোগে এলাকার উঠতি প্রভাবশালীরা অন্য কায়দায় জমি দখল করতে শুরু করে। নকল লোককে জমিদারের বংশধর সাজিয়ে জমির দলিল নিজের নামে করে নেয়। রেজিস্ট্রি অফিসের এক শ্রেণীর মানুষ এতে জড়িত ছিল। সাজাহান সেখের মেজ ভাই সিরাজ ও তার সাগরেদরা এই জমি দখলের মূল পান্ডা।

এক সময় চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে ভেড়ি তৈরী করে লাভ জনক মাছ ও চিংড়ির ব্যবসা শুরু হলো। বড় জমির যে মালিকরা কলকাতা বা দূরে থাকত তারা ভাগচাষীদের আর জমি না -দিয়ে বেশী নগদ টাকার লোভে ভেড়ি ব্যবসায়ীদের দিতে থাকে। বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাগচাষীদের ছোট-ছোট জমি চাষ করতে না-পেরে নগদ টাকার বিনিময়ে ভেড়ির মালিকের কাছে দেওয়া শুরু হলো। জমি চাষ না-করলে ভাগচাষী থাকতে পারবে না- এই অজুহাত দিয়ে ভুয়ো দলিল করা মালিকরা ভাগচাষীদের বিঘা প্রতি পাঁচ কাঠা জমির দাম (যদিও কম দামে) দিয়ে জমিগুলি হাতিয়ে নেয়।

জমিদারী আমল থেকে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সীমান্ত বরাবর টাকরের খাল ছিল। বিশাল এলাকার জল এই খালের মাধ্যমে পুড়েভাঙ্গার উপর দিয়ে মাতলা নদীতে পড়ত। পরে মাতলার পাড় উঁচু হয়ে যাওয়ায় টাকরের খাল বন্ধ হয়ে যায় এবং পরে বুজে যায়। গরীব মানুষ সেখানে ঘর তৈরী করে

দীর্ঘদিন বাস করে আসছে। নকল বা ভূয়ো দলিলে করে সিরাজের দলবল গরীব মানুষদেরকে সেই জমি থেকে উৎখাত করেছে নয়-তো, মোটা টাকার বিনিময়ে থাকতে দিয়েছে।

বেড়মজুর এলাকার বাসিন্দারা আদিবাসী ও হিন্দু ধর্মের। এখানে জমি দখলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় চঞ্চলা সরদার। এলাকায় মহিলাদের নিয়ে চাঁদা তুলে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, ও তাদের মাধ্যমে হাইকোর্টে মামলা করে। চঞ্চলা সরদার কে জব্দ করার জন্য তার স্বামী কে মিথ্যা মামলায় ফাঁসায় ও তাঁদের বাড়ীতে পোলট্রির মুরগি লুঠপাট করে ও সাইকেল নিয়ে চলে যায়। এই খারাপ কাজের হোতা বেড়মজুরের পঞ্চায়েত সদস্য শংকর সর্দার। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেউ নিজের ভোট নিজে দিতে পারেনি। এখানে ১০০ দিনের কাজ করিয়ে অর্দ্ধেক মজুরী দেয়। তবে বাড়ি তৈরীর ১ লাখ ২০ হাজার টাকা সবটা দিয়েছে। এখানকার বাসিন্দাদের মূল জীবিকা নদীতে মীন ধরা। এলাকায় কাজ নেই বলে ছেলেরা অন্য রাজ্যে কাজে যায়।

বেড়মজুর এলাকার বিঘা-বিঘা জমি দখল করেছে শংকর সরদার ও তার নেতারা। জমি আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ার ফলে চাষীদের জমি তাদের দখলে এলেও বিডিও লিখিত ভাবে কিছু দেয়নি। আবার চঞ্চলার মত অনেকে জমি ফেরত পেলেও নিজেরা মাছ চাষ না-করে বছরে বিঘা প্রতি ৮ হাজার টাকায় লিজ দিয়েছে।

এলাকার রাস্তা উন্নত নয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকেও নেই। নদীপথে যাতায়াতের একমাত্র ফেরিঘাটের জন্য পাঁচ লাখ টাকা বরাদ্দ হলেও সেটা চলাচলের উপযুক্ত নয়। ভাটার সময় মালপত্র নিয়ে ওঠানামা করা যায় না। শাজাহান সেখের দুই ভাই সিরাজ ও আলমগীর এবং শংকর সর্দারের উপর বাসিন্দাদের রাগ থাকলেও শাজাহানের উপরে ততটা রাগ নেই। উপরন্তু শাজাহানের সেজ ভাই হাজিসাহেবকে সবাই সম্মান করে। বেশী রাগ শংকরের উপর। শংকর বলেছে, ভোটের পরে তাদের দেখে নেবে। এলাকায় মানুষ কিন্তু সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

তথ্যানুসনধানী দল: মহববত হোসেন, দেবাশিস ভট্টাচার্য, সামসুর আলম, সাজ্জাত মীর ও আক্তারী বেগম

এপিডিআর-এর সমস্ত শাখার কাছে রিপোর্ট পাঠানোর আহ্বান রইল।

রিপোর্ট : এপিডিআর

৬ মে ২০২৪, কলেজ স্ট্রিট ক্রসিং-এ মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল-এর সামনে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীর চাকরি কেড়ে নেওয়া, দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা মন্ত্রী আমলাদের শাস্তি না-দিয়ে চুনোপুঁটিদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার, এস এস সি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায় বাতিলের দাবিতে ও সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসকারী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন।

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের আগের দিন ৩ জুন ২০২৪ যাদবপুর কফি হাউসের সামনে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের হত্যা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী পথসভার আয়োজন করা হয়। ছত্তিশগড়ে এপিডিআর সহ সিডিআরও তথ্যানুসন্ধানী দলকে রাষ্ট্রের প্রশাসন কর্তৃক ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই যৌথবাহিনী সিডিআরও প্রতিনিধিদের আটকে দেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধে এপিডিআর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)-এর প্রতিষ্ঠা দিবস ২৫ জুন গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবাধিকার আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দিন। এই দিনটিকে কলেজ স্ট্রীট জংশনে পথসভার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়।

২৯ জুন ২০২৪ ভারতসভা হল-এ অনুষ্ঠিত হল 'কপিল ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা'। নদী বিশেষজ্ঞ কপিল ভট্টাচার্য এপিডিআর-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। 'অধিকারের দৃষ্টিতে তিনটি নতুন ফৌজদারী আইন (ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, সুরক্ষা সংহিতা ও সাক্ষ্য অধিনিয়ম)' শীর্ষক বক্তব্য রাখেন। পি ইউ সি এল-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং তামিলনাড়ু হাইকোর্টের আইনজীবী ড. ভি সুরেশ বক্তব্য রাখেন।

ইংরাজি ভাষায় বক্তব্য রাখলেও তাঁর সহজ এবং সুলোলিত সাবলীল শব্দচয়নে বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়। দর্শক সাধারণের বিষয়টি বোধগম্য হতে কোনও অসুবিধা হয়নি। সাধারণ ছাত্র, আইনের ছাত্র, আইনজীবী সহ এপিডিআর-এর সদস্যদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি সভাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে।

এপিডিআর-এর মুখপত্র 'অধিকার' পড়ুন ও পড়ান